চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম-সম্প্রদায়-সমাজ : উপন্যাস ও গল্পে তার প্রতিফলন

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি এসে শোষণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে ভারতে থেকে গেছে। আবার অনেকে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেছে। এইভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের বাস হয়ে উঠেছে এই ভারতবর্ষ। ধীরে ধীরে বর্ণ-ধর্ম-অর্থনীতি- রাজনীতির স্থান অনুযায়ী বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। আর সেই সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সমাজে মানুষের স্থান নির্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ; উচ্চ নীচ ; হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রিস্টান; জৈন-বৌদ্ধই শুধু নয়, নারী ও পুরুষ দুটি আলাদা সম্প্রদায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও অর্থনীতি শিক্ষা রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভেদ লক্ষ করা যায়। সমাজের এই ভেদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় সমাজে যারা শিক্ষিত, অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী তারাই রাজনীতিতে অগ্রণী স্থান গ্রহণ করেছিল। সেই সময় শিক্ষা-রাজনীতি থেকে চাকুরির ক্ষেত্র পর্যন্ত সব জায়গায় হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়ার ফলে পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের ক্ষোভ উগ্র আকার ধারণ করতে থাকে। এর ফল স্বাধীনতা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। আর সাহিত্য যেহেতু সমাজকে নিয়ে গড়ে ওঠে, তাই সম্প্রদায়গত রেষারেষি ও ভাঙন সাহিত্যেও বিশাল প্রভাব ফেলে। আমাদের আলোচ্য লেখক গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে সেই সমস্ত ঘটনারই বিবরণ লক্ষ করা যায়। আর সেই সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করাই আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের কাজ। বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণের আগে ধর্ম সম্প্রদায় ও সমাজ বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

পরিবার গঠনের ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছিল সমাজ। আবার সমাজ গঠনে ভাবনার মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি একটু বড়ো। এই তিনটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটি একটু জটিল। এই সমাজ নামক জটিল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসবাস করছে নানা ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্ম ও সম্প্রদায় বিষয় দুটি নানান দিক থেকে খটমট। ধর্ম নামক বিষয়টি নানা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, দেশ-জাতি-কুল অর্থাৎ সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্রবিধি, আচার-অনুষ্ঠান যা লোকে ধারণ করে থাকে। অন্যদিকে সম্প্রদায় বলতে বিভাগ বা দলকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের উপর ভিত্তি করে যে বিভাগ গড়ে ওঠে। আবার বিভিন্ন ধর্মেরও নানা ছোটো ছোটো বিভাগ ও দল রয়েছে। বিষয়টিকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হল মাত্র—

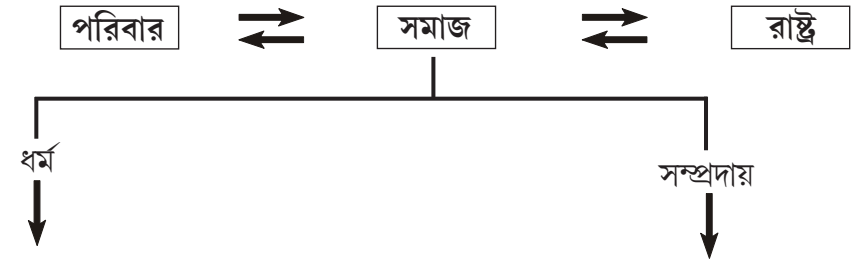

[বিশেষ শাস্ত্রবিধি, আচার-অনুষ্ঠান যা লোকে ধারণ করে। (হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন প্রভৃতি)]

[বিভাগ বা দল। হিন্দুর হতে পারে। মুসলিমের হতে পারে, বিভিন্ন ধর্মের হতে পারে। আবার হিন্দুধর্মের বা মুসলিম ধর্মের নানা বর্ণগত বা শ্রেণিগত বিভাজন রয়েছে। যেমন—হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়, বৈশ্যসম্প্রদায় বা শূদ্র সম্প্রদায় আবার মুসলিমদের ক্ষেত্রে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়। এছাড়া আমাদের সমাজে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি সম্প্রদায় হল—নারী সম্প্রদায় ও পুরুষ সম্প্রদায়।]

আমাদের উপরিউক্ত ছকের বিষয়গুলিকেই এবার আমরা বিশ্লেষণ করব সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আমাদের লেখকের সাহিত্যে সময়সীমা হিসেবে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পূর্ব,স্বাধীনতা সমসাময়িক ও স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ। কারণ সমাজের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ-রিরংসা, এমনকি ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভেদের রাজনীতি। এখন প্রশ্ন হল ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতদিনের? নাকি এই সম্পর্ক ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান খোঁজা হয়তো সহজ নয়। এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে রাজনৈতিক সমাজ বিশ্লেষকদের হাত ধরে। এ প্রসঙ্গে গৌতম রায়ের একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> ‘রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক আসলে প্রাচীন। ধর্ম যখন দর্শনের পোশাক পরতে শেখেনি, যখন আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জাদুবিদ্যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেশি, যখন আদিম পৃথিবীর নানা আধিভৌতিক রহস্য উন্মোচনে অপারগ মানুষ বজ্র-বৃষ্টি-বন্যা-খরা-ভূকম্প-অগ্ন্যুৎপাতের ব্যাখ্যাকার বা নিয়ন্তা হিসেবে শামান-ওঝা-জানগুরুদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সেই যুগ থেকেই ধর্ম রাজশক্তির সহায়ক, শাসকের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কখনও ধর্মীয় রহস্যবেত্তা ওই জাদুকররা নিজেরাই শাসক। তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা, প্রাকৃতিক নানা রহস্য ব্যাখ্যায় বা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম বিশেষ গুণপনা তাঁদের অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়, ওপরে স্থান করে দেয়, তাঁরা নিজেরাই হয়ে ওঠেন তাঁদের দিকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চেয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পরে জনগোষ্ঠীর বিকাশ, শাসনপ্রণালীর জটিলতা বৃদ্ধি শাসক ও ধর্মগুরুর সামাজিক কৃত্যকে পৃথক করে দেয়। তবে মানবেতিহাসের কোনও পর্বেই ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সেক্যুলারিজম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচরণের প্রাঙ্গণ থেকে ব্যক্তিগত জীবনাচারের আঙিনায় নির্বাসিত করেছে মাত্র। [রাজনীতির প্ররোচনা, ধর্মের ঘাতকরূপ, এককমাত্রা, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৩][১]

শুধু ইউরোপ নয় ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ঐতিহ্যও কখনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত ভাবে গড়ে ওঠেনি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে রাষ্ট্র কোনও সাহায্য করবে না, তা রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা কখনোই ভাবতে পারে না। আর তাই ধর্মকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রনেতারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার ব্যতিক্রম নয়। এরই ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে শৈবাল মিত্র বলেছেন—

> বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতীয় মুসলমানরা বুঝতে পারছিল যে পৃথিবী জুড়ে যুগান্তর ঘটতে চলেছে। সংখ্যালঘু মুসলমানরাজ কায়েম করা যাবে না। সেই রাষ্ট্রকে চালানোও অসম্ভব হয়ে উঠবে। সংখ্যালঘুদের জন্য, তাদের আলাদা ভূখণ্ডের দাবির ন্যায্যতা, ঔপনিবেশিক শাসকরা মেনে নিতে তারা মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তান বানাল। দেশভাগের দর্শন ভারতীয় মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ইংরেজ। ভারতীয় মগজের মাটিও তৈরি ছিল বিভাজন তত্ত্ব মেনে নিতে। নীতিহীনতা আর বিভাজন, দুই-এর উৎসে ছিল ধর্ম আর রাজনীতি। সম্প্রসারণবাদী ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থী, শুদ্ধতাবাদী হিন্দুধর্মের হাজার বছরের বিরোধ নতুন মাত্রা পেল। নতুন মাত্রা জুগিয়ে দিল পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি, বলা ভালো, শ্বেত-মহাদেশের কূটনীতি গিলে নিল উপমহাদেশের মগজ। তাদের মাথায় জমে থাকা বর্বর যুগের অন্ধকার, সরলতা আর নীচতা শঠতা আর সাধুত্ব, মিলিয়ে যুগোপযোগী ক্যানিবালিজম দুর্নীতি আর বৈরাগ্য-এর জন্ম দিল। উপমহাদেশ জুড়ে ধর্ম আর রাজনীতির নামে স্বগোত্রভোজের অনুষ্ঠান আগের চেয়ে আরও চাকচিক্যমণ্ডিত তাণ্ডব মূর্তি গ্রহণ করল। [এই উপমহাদেশ ক্রুশবিদ্ধ যীশু, একক মাত্রা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৯][২]

বিশ শতক থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদের সুর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঁধা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার অনেক আগেই হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীরা তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গণমানসে পুরাণকথা বা অতিকাহিনির

(মিথ) মধ্য দিয়ে অন্ধসংস্কারের আবরণ রচনা করেছিলেন। সেই অন্ধ আবরণ ক্রমশ ভারী হতে থাকে। এর ফলে সামাজিক বাতাবরণে ঘনিয়ে ওঠে পঞ্জীভূত কালো মেঘ। ধর্মীয় বিষবাষ্পে মৃতপ্রায় ভারত তথা বাংলার সমাজ। বাংলার কঙ্কালসার সমাজের চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন লেখক গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'দেশ-মাটি-মানুষ' এপিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই এপিক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'জল পড়ে পাতা নড়ে', এই উপন্যাসটির কাহিনির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং কুসংস্কারকে ঘিরে গ্রামের মানুষ কীভাবে দিনের পর দিন বেঁচে আছে, সমাজকে সংস্কারমুক্ত করার বদলে হিন্দু-মুসলমান সমাজের সমাজপতিরা দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক থেকে ধর্ম বড়ো হয়ে দাঁড়াল। বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলল হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে। মানুষের জন্ম মুহূর্তের প্রসব যন্ত্রণা থেকে শুরু করে অর্থনীতি, রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ শতকে ত্রিশের দশকের বাংলার গ্রামের রূপ ছিল অন্যরকম। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ তখনও গ্রামগুলোতে আছড়ে পড়েনি। গ্রামের মানুষ শিক্ষায়-দীক্ষায় শহরের মানুষের থেকে ছিল পিছিয়ে। তারা শুধু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হিন্দু মৌলবাদ-মুসলিম-মৌলবাদ নিয়ে মেতে থাকত। উপন্যাসটিতে মেজোকর্তা ছিল সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে। তাই তাকে বলতে শোনা গেছে—

ঈশ্বর এক। সকলকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চোখে উঁচু জাত নিচু জাত নেই। ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ মাত্রেই মানুষের ভাই। ভাইয়ের হাতের জল ভাই খাবে বই কী।" [জল পড়ে পাতা নড়ে, পৃ. ২২][৩]

কিন্তু উপন্যাসের শুরুতেই আরেক হিন্দু সরকার মশাই ইসলাম ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে বলেন—

> ওগের সবই উলটো বুঝলি রাম। আমরা যা করব, উরা তার উলটো করবে। আমরা পুবমুখী আহ্নিক করি, উনারা পশ্চিমমুখী নমাজ পড়েন। আমরা বাইরির থে বাড়ি আসে আগে পায়ে জল দিই, উনারা আগে হাতে জল দেন। আমরা পাঁঠার ঘাড়ে কোপ মারি, উনারা গলায় পোঁচ মারেন। কত আর কব? [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫][৪]

শুধু তাই নয় মুসলিমদেরকে ছোটো করে দেখাই হিন্দুদের অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। মুসলিমরা নাকি চিরকাল নাঙ্গলা চাষা হয়েই থাকে। তারা শিক্ষায়-দীক্ষায় হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে। কিন্তু হিন্দুরাও যে শিক্ষায়-দীক্ষায় তাদের থেকে খুব এগিয়ে চলেছে তাও নয়। তবে শহরে কলকাতার চেহারা গ্রামের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। শহরে মিয়ারা উকিল, ডাক্তার এমনকী জজ ম্যাজিস্টরও নয়। সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম কোনো ভেদ লক্ষ করা যায় না। শহরে শিক্ষায় শিক্ষিত মেজো কর্তা তাই গ্রামে এসে পাঠশালা খুলেছিলেন। এবং হিন্দু মুসলিম সব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে পড়ুয়া জোগাড় করেছিলেন। অমনি গ্রামে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায়, তার সম্বন্ধে গ্রামে রটে যায় তিনি নাকি বেহ্মজ্ঞানী হয়ে এসেছেন। এতে গ্রামসুদ্ধু মাতব্বররা চটে যায়, বিশেষ করে গ্রামের পুরুত সমাজ। পুরুত মশায় গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে বেড়াতে লাগলেন—

> যে মহির পাঠশালায় ছেলে পাঠাবে, সে জাতিচ্যুত হবে, সে উচ্ছন্নে যাবে। পুরুত ঠাকুর খুব তেজি লোক। আটখানা গ্রামে তাঁর বিধান চলে। তাঁর কথা অমান্য করবে কে? পাঠশালায় কেউ ছেলে পাঠালো না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২][৫]

গ্রামের সমাজ যে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তা ভেবেই অবাক লাগে মেজোকর্তার। মেজোকর্তা আরো চিন্তিত হয়ে ওঠে মেয়ে বুড়ির প্রসব ব্যবস্থার কথা ভেবে। কারণ বিশের দশকের গোড়ার দিকে সরকারি চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল থেকে বাড়িতেই বেশি সন্তান প্রসব হত। কিন্তু গ্রামে এইসব প্রসব ব্যবস্থাকে ঘিরে ছিল নানা ধরনের কুসংস্কার। তার কতগুলো নমুনা দেখিয়েছেন লেখক, বুড়ির প্রসব ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। যেমন—(ক) বড়োবউ মেজোকর্তাকে বলা উক্তির মধ্যে—

> কলকাতার শাস্তর কলকাতায় চলুক, দেশে তো তা চলবে না। এখেনকার নিয়ম হচ্ছে, যে ঘরে ছেলেপুলে হয়, সে ঘরডা নোয়ার কামানের দিন ভাঙ্গে ফেলাও হয়। না হলি পোয়াতির উপর দিষ্টি লাগে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬][৬]

(খ) অন্ন এবং বড়োবউ-এর কথপোকথনে—

> তাঁতি-বউর পা-ধুয়ানো জলও আনে রাখিছি। পেরথম পুয়াতি। বলা তো যায় না, কখন কোনডে দরকার লাগে! এ-অঞ্চলে তাঁতি বউয়ের খুব সুনাম। আট-দশটা ছেলেপুলের মা। একটি ফোঁটা কষ্ট কোনওটার জন্য পায়নি।

ব্যথা উঠেছে কি প্রসব হয়ে যায়। তাই এ অঞ্চলের দাইরা তাঁতি-বউয়ের পা-ধোয়ানো জল এনে রাখে। যে প্রসূতি বেগ দেয়, প্রসব হতে যাদের কষ্ট হয়, দাইরা সেইসব প্রসূতিকে তাঁতি-বউয়ের পা-ধোয়ানো জল খাইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থ ফল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪][৭]

(গ) শুভদার আচরণে—

শুভদা ঠাকরুন কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে বসেছেন। তিনি গিরিবালার চুলের ডগের গিঁটটাও খুলে দিলেন। কী একটা শিকড় বেঁধে দিলেন এলোচুলে। বড়বউ লেপের ওয়াড়, বালিশ-তোশকের ওয়াড় খুলে ফেললেন। সব বন্ধন মুক্ত করা চাই। বাইরের বাঁধন খুলে দিলে যদি গিরিবালার পেটের বাঁধন আলগা হয়! তখন যদি ত্বরায় প্রসব হয়। বাক্সের তালা, কাঠের সিন্দুক, হাতবাক্সের ডালা খোলা। কুড়ের বেড়া কেটে দাও। নিয়ম-রীতি মেয়েদের যা জানাছিল, সব তাঁরা পালন করলেন। ফল কিছু হল না। রিদয় ঠাকুর এসে মন্ত্র পড়লেন, অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভোলী নামা রাক্ষসী, তস্য স্মরণমাত্রেণ সুখপ্রসবং ভবেৎ। কিন্তু জম্ভোলীর মরণেও প্রসব হল না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১][৮]

উপরিউক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার বলয়ে ডুবে থাকা গ্রাম সমাজকেই দেখিয়েছেন লেখক। গ্রামকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোর পথ দেখানোর চেষ্টা করেছিল উপন্যাসের মেজোকর্তা। গ্রামের অশিক্ষার চিত্র দেখে মেজোকর্তা বলেছিলেন—

এদেশের লোক ঘেঁটুপুজোয়, মনসাপুজোয় ঘটা করে টাকা খরচ করে, এমনকী সরস্বতী পূজোতেও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে রাজি, কিন্তু ইস্কুল গড়ার ব্যাপারে উপুড়হস্ত করতে চায় না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৬][৯]

তিনি বলেছিলেন, ইস্কুল কমিটির মেম্বারদের মধ্যে অর্ধেক থাকবে মুসলমান আর বাকি অর্ধেক থাকবে হিন্দু। আবার হিন্দুদের সংখ্যার ভিতরে থাকবে কিছু শিডিউল কাস্টও। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনার মধ্য থেকে ব্যক্তি মানুষকে নিষ্কাশিত করতে চেয়েছিলেন এবং একটি স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন—''সমাজের ভিত যদি আলগা থাকে, তাহলে তার উপর ইমারত গড়ে যত রংই লাগাই না কেন, সে ইমারতের আয়ু বেশি হতে পারে না। নোনা ইটে কি মজবুত দালান বানানো যায়? সমাজের মধ্যে আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা খ্রিস্টান, আমরা উচ্চবর্ণ, আমরা নিম্নবর্ণ এই যদি আমাদের পুঁজির প্রধান কড়ি হয়, তবে কতদূর যেতে পারি আমরা? [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৮][১০] আর একমাত্র শিক্ষাই পারে সংস্কার মুক্ত এক সমাজ গড়ে তুলতে। অর্থাৎ যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের মূল্য গ্রহণ করার প্রেরণা জোগাবে। শিক্ষা-স্কুল গঠনকে কেন্দ্র করে গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সরকারও এই দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে, দ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে তোলে। সরকার গ্রামে মোসলেম মিডল মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়। কারণ মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের অগ্রাধিকার দানই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিজের নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে।

মুসলমান-সমাজ নতুন প্রভু ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এখন দ্রুত সে দূরত্ব কমাতে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। হিন্দু-সমাজ পুরনো প্রভু মুসলমানদের বিকল্প বলেই ইংরাজদের কাছে সরে এসেছিল। তাদের ভালমন্দ দোষগুণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকদিন ধরে আত্মসাৎ করেছে হিন্দু-সমাজ। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, নিতান্ত চাকুরীনির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে। বিশেষ করে কেরানিদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে কী অদ্ভুত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়! বিপরীত ভাবধারার শত স্রোতে ভাসা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১১]

বিশ শতকের ত্রিশের দশকেই জন্ম নিয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। আর এই সমাজে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করত। পূর্বের গ্রাম্য সমাজের মানুষগুলোই একটা নতুন কুর্তা চাপিয়ে, পুরোনো চেহারা ঢাকা দিয়েছে। উপন্যাসে মেজোকর্তা তাই সমাজে নতুন উদ্ভব হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

যেন মেকেঞ্জি লায়ালের নিলামখানা থেকে কেনা পুরনো সোফা কোচ দিয়ে মানসচেতনার চণ্ডীমণ্ডপটা সাজিয়েছি শুধু। তাই আমাদের ব্রাহ্মণত্ব ঘোচেনি, হিন্দুয়ানি যায়নি। তাই প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেও মুসলমানদের আমরা মানুষ বলে ভাবতে শিখিনি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১২]

মুসলমানরাও ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠে। তারা স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকে। তাদেরও অবস্থা হিন্দুদের মতো হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে—

তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব যত-না-জাগছে, মুসলমানত্ব তার চেয়েও দারুণ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১৩]

শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। ইউরোপও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ইয়োরোপে একদিন শিল্পবিপ্লব হল, ফরাসি-বিপ্লব হল। পুরাতন কাঠামো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বেড়িয়ে এল এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চিন্তায়, কর্মে জীবিকার্জনের উপায়ে যারা একেবারেই নতুন। পৃথিবীর রংই যারা বদলে দিল। মানুষ সম্পর্কে ধারণার ভূগোল অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। যুক্তি, বিবেক, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মানুষের নতুন মূল্য নির্ধারিত হল। ইয়োরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই হল নতুন অর্ঘ্য। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১৪]

কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত ছিল। গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শিক্ষার আলো থেকে দূরে। গ্রামবাংলায় তারা ছিল হিন্দু ও মুসলমান সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই সমস্ত মানুষগুলো গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা উৎপাদিত ফসল এবং অর্থের বিনিময়ে ফুলেফঁপে উঠতে লাগল। উপন্যাসে যেমন—গোপাল বিশ্বাস বা মেদ্দা সাহেব।

দোকানের মাঝখানে উঁচু বেদি। আগে এখানে মকর বিশ্বেস আটহাতি মোটা ধুতি আর ফতুয়া পরে একা একা বসতেন। এখন গোপাল সেখানে নবরত্ন সভা বসিয়েছে। জাতে তাঁতি হলেও, সেই এখন এ-তল্লাটে হিন্দু সমাজের মাথা। সরকার মশাই, স্যান কবিরাজ, বুদো ভুঁয়ে, ইস্তক রিদয় ঠাকুরও গোপালের সভার নিয়মিত সভাসদ।....

হাটের ইজারা ওর, খেয়াঘাটের ইজারা ওর, কেরাসিন তেলের সোল এজেন্সি-ওর। সমাজের বামুন-কায়েত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে আঙুলের ইশারায় ওঠবোস করাতে পারে তাদের। কিন্তু সে ইচ্ছেই করে না গোপালের, কখনও করবেই না। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, এ বিধির বিধান, গোপাল সেটা মানে। জানে সে বৈশ্য। রিদয় ঠাকুর বিধান দিয়েছেন বৈশ্যের জল, বিশেষ করে লক্ষ্মীর যে বরপুত্র, তার হাতের জল সমাজে চলে। বাপের উপর এখানেই টেক্কা মেরেছে গোপাল। তার পরিবারকে সমাজে উঠিয়েছে। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণ এসে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। কায়স্থ বৈদ্য পাতপেড়ে খেয়ে গিয়েছেন। আর তার জন্য গোপালকে বিদ্রোহ করতে হয়নি, ঘটা করে শুদ্ধি আন্দোলন করতে হয়নি, ভিক্ষুকের মতো কারও কৃপাপ্রার্থীও হতে হয়নি। শুধু সে একবার মনের ইচ্ছা সবিনয়ে প্রকাশ করেছিল মাত্র। শাস্ত্রমতেই সমাজ আপনা থেকেই তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এখন, সত্য বলতে কী, গোপাল এখনকার সমাজের মাথা। হাটের ইজারা, খেয়াঘাটের ইজারা, কেরোসিন করোগেট টিন আর সিমেন্টের সোল এজেন্সি যেমন তার, গোপাল জানে, এই সমাজও তেমন তার, তারই। তার এখন একটিমাত্র বাসনা, সরকারের সঙ্গে একটু দহরম-মহরম করে। কিন্তু সেখানে যে ওই মেদ্দাটা আগে থেকেই পাত বিছিয়ে বসে আছে। লোকে যে বলে, না'ড়েরা বড্ড সরকারের পা-চাটা হয়, তা সে কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। মেদ্দা ব্যাটা আবার তা সবার ঘাড়ে পা দিয়ে চলে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৯][১৫]

সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি চিরকালীন একটা দ্বন্দ্ব। যা সমাজ থেকে কোনোদিন নির্মূল হবার নয়। জল পড়ে পাতা নড়ে উপন্যাসের মেজো কর্তার মতো কিছু সমাজ থেকে জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সরব হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আবার তা তলিয়েও যায়। হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষকে টিকিয়ে রাখতে ব্রিটিশরা প্রথম থেকেই তৎপর ছিল। ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তশ্রেণিকে। সে কথাই বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে—

> সদ্য লব্ধ সাম্রাজ্য হাতে রাখার জন্য ইংরেজ এককালে হিন্দুতোষণ শুরু করেছিল। এখন পড়তির মুখে এসে সেই সাম্রাজ্য কোনওমতে টিকিয়ে রাখবার জন্য সেই ইংরেজ আজ মহোৎসাহে মুসলমান তোয়াজ শুরু করেছে। স্বদেশ থেকে মানব-প্রেম, ন্যায় নিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসে ইংরেজ এদেশে, বিভেদ, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজ বপন করছে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১৬]

ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করে আগে থেকেই। উভয় সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা ধর্মের কুসংস্কারের বীজ বপন করে দিয়েছিল। এর ফলে মানুষের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মসংস্কার। তাই হিন্দুর জল মুসলমান ছুঁয়ে দিলে, সেই জল হিন্দুর ঘরে ঢোকানো যায় না। উপন্যাসটিতে বিকলিস ও টগরের স্নান ঘাটের দৃশ্যে সেটাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

> কী আবার হবে, কাজডা বাড়ায়ে দিলি, আর কী? ভাগ্যিস্ পিতলের ঘড়া আনিছিলাম তাই রক্ষে। মাটির কলসি হলি ফেলে দিতি হতো। যা, তুই বাড়ি যা। আমি যাই ঘাটে নামি। ঘড়াটা মা'জে আবার একটা ডুব দিয়ে জল ভরে নিয়ে আসি গে।
>
> টগর কাঁখ থেকেই ঘড়া উপুড় করে ঘড়ার জল ফেলে দিতে লাগল। অপ্রস্তুত বিলকিস করুণ্ চোখে দেখতে লাগল টগরের ঘড়ার জল গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন মোটা একটা দাগ কেটে নদীর দিকেই নেমে যাচ্ছে। [প্রেম নেই, পৃ. ৮][১৭]

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বিলকিস টগরের কার্যকলাপ দেখে নিজের মনেই সে বলে উঠল—

> ও গুলাপফুল, ঘড়ার পানি তো ফেলে দিলে, নদীর পানি ফ্যালবা কনে, সিডা এখন আমারে কত্তদিনি?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮][১৮]

এতো গেল ধর্মের বহ্যিক আচরণ। ধর্ম শুধু দুটি জাতের মানুষের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়, একই সঙ্গে সমাজের দুটি প্রধান স্তম্ভ নারী ও পুরুষের মধ্যেও বিভেদ রচনা করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বিভেদ রচনা করেছে নারী ও পুরুষের অবস্থানের উপর। মুসলিম ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিভেদ সবচেয়ে বেশি। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে ফকিরকে বলতে শোনা যায়—

> কোরাণের বাণী আর নবীর বচন।
> মন প্রাণ নিয়া আরও শুন বিবিগণ ।।
> যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে।
> কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে ।।
> শতশত সাপ বিচ্ছু কাটিবেক তথা।
> দিবানিশি আগুনেতে জ্বলিবেক সেথা ।।
> আরও কত কষ্ট তার নাহিক শুমার।
> সে সব কষ্টের কথা কি বলিব আর ।।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬][১৯]

আরও বলা হয়েছে—

> 'দেল জান দিয়া তাঁর মন যোগাইবে।
> পতিরে প্রাণের চেয়ে মমতা করিবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬][২০]

অর্থাৎ, 'পতি ধন! জীবনের জীবন!' মুসলিম সমাজে নারীদেরকে শেখানো হয়েছিল মন দিয়ে পতির সেবা করলেই স্বর্গ লাভ সম্ভব। মুসলিম সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা তাদের পাঁচ ফরজ-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

''মুসলমানের পাঁচ ফরজ। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ আর জাকাত। এই পাঁচটা পিরতিজ্ঞে যে মুসলমান পুরো কত্তি পারে আল্লার হাজার শোকর সব সুমায় তার মাথার উপর থাকে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১১][২১]

তাঁদের কাছে বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ এর গুরুত্বই বেশি। তাঁরা মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বলতে ঘরে বসে আরবি শিক্ষাকে বুঝেছিলেন। তাঁদের মতে—''মুসলমানের মেয়ে আরবি পড়বে না তো পাক্ কোরাণ তেলায়ে, করবে কী করে?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯][২২] গ্রাম সমাজের মুসলিম মেয়েরা যখন বিদ্যালয় শিক্ষার আলো থেকে শতবর্ষ দূরে। তখন কলকাতা শহুরে মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষার জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শহরে সমাজ বুঝতে পেরেছিল 'বিদ্যা আমাদের চক্ষুস্বরূপ, ইহা ক্রমেই বুঝিতেছি। উহা যত আমল হইবে দুনিয়াকে ততই সাফ দেখা যাইবে।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬][২৩] মুসলিম সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা অর্থাৎ মৌলবীরা শুধু নারীদেরকেই শিক্ষার আলোর থেকে দূরে রেখেছিল তাই নয়, পুরুষদের শিক্ষার ব্যাপারেও তারা ছিল উদাসীন। উপন্যাসটিতে মৌলবী সাহেবের কথায় তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—হাজি সাহেব তার ছেলেদের লেখাপড়ার কথা বললে তার উত্তরে তিনি বলেন—

আল্লাহ যা করেন তা মঙ্গলের জন্যিই করেন। আরে পাশ দেনেওয়ালাগের কথা ছাড়েন তো দেখি। ওগের দেখে আমার ঘিন্না হয়ে গেছে। মুসলমানের ছাওয়াল দ্যাড় পাতা ইংরাজী ল্যাখাপড়া শিখে বোধ হয় সিংঘির পাঁচ পা দেখিছে। তখন পিরেন তহ্বনধ্ পরতি তাগের লজ্জা হয়। দাঁড়ি গোঁফ চাঁছে ফ্যালায়ে মুখখানিরে করে তোলেন য্যানো যাত্রাদলের সখি। টুপিডে অবধি মাথায় দ্যায় না। তা জানেন? অথচ টুপি মুসলমানের সব সুমায় দরকার লাগে। নামাজের সুমায়, খাওয়ার সুমায়, মুরব্বিগের সামনে গিয়ে দাঁড়াবর সুমায়, কুরআন শরীফ পড়তি গেলি, ঘরের বাইর বেরোতি হলি, অ্যামন কি পায়খানার পিসাব করতি গেলিও টুপি পরা মুসলমানের সুন্নত। আর সেই টুপি কিনা আজকালকার পাশ দেনেওয়ালা মিঞাগের কাছে য্যানো জানি-দুশমন হয়ে উঠিছে। মিঞারা যত পাশ দেচ্ছেন ততই য্যানো মুসলমান বলে পরিচয় দিতি লজ্জা পাচ্ছেন। হিন্দু না মুসলমান কলেজ পাশ ছাওয়ালগেরে দেখে তা ঠাহর করি কতি হয়।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩][২৪]

তাছাড়া তিনি শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন—

বড় মিঞা সব বিটা পাশ দিয়ে দিয়ে গোল্লায় যাতি বসিছে। অমুসলমানি পোশাক পত্তিছে। আচকান, পায়জামা, লুঙ্গি আর টুপি পড়া ছাড়ে মিঞারা গোঁফদাড়ি চাঁছে মিহিন ধুতি আর বিলাতি সার্ট পত্তিছেন, দেখলি য্যানো তাগের রাম শ্যাম যদু বলে মনে হয়। শুধু কি এনারা?আর এনাগের কুল-মহিলারা? তাঁরাও আজ ইজের-তহবন কোর্তা-চাদর ফেলে অ্যাখন ফরাস ডাঙ্গার উলঙ্গ বাহার শাড়ি পত্তিছেন। তাঁরাও আজ ময়ূরির পালক পাখায় গুঁজে আশালতা প্রেমলতা অনুপমা ও নিরুপমা হয়ে উঠতিছেন।...

....যে শিক্ষা মুসলমানের ছাওয়ালদের যা মজহবী করে তোলে, মৌলবী, মোল্লাদের উপহাস করতি শিখায়, সেই পাশ-দেওয়াটা আমাগের কোন্ কাজে লাগবে? ভাই মুসলমান আজ আমাগের বড় দুর্দিন। ইসলাম বিপন্ন। আমাগের ছাওয়ালের আমরা বুকির রক্ত দিয়ে রোজগার করা টাকায় পাশ দিতি পাঠাচ্ছি আর তারা পাশ দিয়ে আসে হিন্দুয়ানীতি রপ্ত হয়ে পরতিছে। তারা আর ''খোতবা" পড়তি পারে না। ইডা কি হাসির কথা? তাই জমায়েতে ইর সব হাজির থাকলিউ যারা এগের তুলনায় ঢের কম ল্যাখ্যাপড়া জানে সেই তাগেরই এমামতি করবার জন্য ডাকতি হয়। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩][২৫]

শিক্ষা সমন্ধে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য গ্রাম সমাজের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষদেরকে হিন্দু সমাজ হিন্দুধর্ম এমনকি নিজেদের ধর্মের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রেণি শত্রুতে পরিণত করে তুলল। মৌলবী সাহেব শিক্ষিত মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার করতে লাগলেন।

সেই সব কাফেরের বিদ্যা কুফরি কালাম আর ইংরাজি শিক্ষা এলমে বেদীন পড়ে যারা পাশ দিয়ে আসতিছেন, তাগের কথা। ইনারাই তহবনধ পরা টুপী পরা ছাড়িছেন। মুসলমান দেখলি নাক শিঁটকোন, হিঁদুগের মতোই তাগেরে মোল্লাজী, কাট-মোল্লা এইসব বলে ঠাট্টা করেন। ইনারা অ্যাখন হিঁদুগের গায় গা ঠ্যাকায়ে বাবু হবার জান্যি কী কাণ্ডালপনাই না দ্যাখাতিছেন। কিন্তু ইডা বোজেন না যে, পাশই দ্যান আর যাই দ্যান, তাগের ছুঁয়া লাগলি হিঁদুগের হুকোয় পানি নষ্ট হয়। নাড়ের গায়ে গা ঠ্যাকলি হিঁদুগের শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। ভাই মুসলমান, তুমরা ভাবো, বুঝে দ্যাখ, ঐ সব পাশ দেওয়া মুসলমান বাবু আর তুমরা অ্যাক কি না? যারা ধর্ম মানে না, শরিয়ত মানে না, কুরআন পড়ে না, যারা বেনামাজী তারা আর তুমরা অ্যাক কি না? না যদি হত তাহলি ওগের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে শাদী দিবা না। সম্পর্ক রাখবা না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৪][২৬]

মৌলবী সাহেবেরা ছিল ইংরেজি কেতাবি শিক্ষার বিরোধী। তাঁরা মুসলমান ছেলেদেরকে মক্তব মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন। তৎকালীন সময়ে মক্তব মাদ্রাসার জীর্ণ অবস্থা দেখে তাঁদের ক্ষোভ আরো ফেটে পড়েছে। তাঁদের ক্ষোভ থেকে রেহাই পায়নি মুসলিম লেখকেরা। ধর্মের গোঁড়ামিকে কেন্দ্র করেই গ্রাম সমাজে শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষকেই অনেকেই মনে করেছে মানুষের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। তাই হাজী সাহেবের মতো মানুষেরা মনে করতেন—

সমাজ বর্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীর সাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত ; তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ সমাজের উন্নতিকে অন্যূন আরও কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছেন।'

....বঙ্গদেশে বেহার ও হিন্দুস্থানের মৌলানা নামধারী একদল লোক আছেন—ধর্মভীরু বাঙালী মোছলমান পালকী, বজরা, পাগড়ী ও আবা কবা দেখিলেই মুগ্ধ হয়। ঐ সকল নামধারী মৌলানাগণের মধ্যে শতকরা অর্ধেক লোক যোল আনা মূর্খ, আরবীতে নামটা পর্যন্ত দস্তখত করিতে জানে না, শতকরা ৩০ জন সামান্য আরবীতে জ্ঞান রাখে। শতকরা ২/৪ জন লোক বিদ্যাবুদ্ধি রাখেন বটে, সমাজের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা ব্যতীত তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার আর কিছুই হয় না।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৫][২৭]

অন্যদিকে হিন্দুসমাজের বেশিরভাগ মানুষই মুসলিম ও সমাজের উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলিমদের সঙ্গে একসাথে হিন্দুরা কাজ করবে, তা অনেক হিন্দু মাতব্বরেরা মেনে নিতে পারেননি। সেই চিত্র দেখতে পাই 'প্রেম নেই' উপন্যাসে ফটিকের স্কুলের চাকুরিতে যোগদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে—

রামানন্দ পণ্ডিতের জিভেয় ছিল খুরের ধার। ইশকুলে যোগ দিয়ে যখন শুনলেন ব্যাপারটা, তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ওকে অপমান করার জন্যই গঙ্গাজল চেয়ারে ছিটিয়ে তবে বসেছিলেন। ছাত্রদের গোবর দিয়ে জিভ সাফ করে আসতে বলেছিলেন। আসলে অধিকাংশ শিক্ষকই তখন তার উপর খেপে ছিলেন। তার কারণ হরিপদ স্যারের সুপারিশে ক'দিন আগেই তাকে সহকারী হেড মাস্টারের পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। রামানন্দ পণ্ডিতের ব্যবহারে প্রথম দিন থেকেই সে আহত হয়ে এসেছে। ও একা নয়, ভূগোল আর অঙ্কের টীচার ধনঞ্জয় মণ্ডলও। ফটিকের স্পষ্ট মনে আছে, হরিপদ স্যার যেদিন ওকে চাকরি দিলেন, টীচার্স রুমে ওকে এনে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ''শফিকুল মোল্লা, আমাদের নতুন সহকর্মী"—হরিপদবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই রামানন্দ পণ্ডিত খেঁকিয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা কী, কন্ তো হরিপদ বাবু? আপনার মতলবটা কী?

....এই তো গত বছর ঐ ধনা চাঁড়ালটারে ঢুকোলেন। আর ইবার কিনা জ্বলজ্যান্ত একটা কাটা মানে যবন ঘরে আনে তোললেন! ক্যান দেশে কি ভদ্দর লোকের দুর্ভিক্ষ লাগে গেছে যে এই ইস্কুলি তাগের মধ্যি যে মাস্টার পাওয়া যাচ্ছে না?

...কিন্তু আমাগের দিকটাউ তো অ্যাকবার দ্যাখবেন? চাকরি করতি আসে ব্রাহ্মণ সন্তান জাত ধম্ম তো আর জলাঞ্জলি দিতি পারি নে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৮][২৮]

হিন্দু সমাজের পণ্ডিতেরা নিজেদেরকে উচ্চ শ্রেণি বলে চিহ্নিত করার জন্য অন্যান্য মানুষদেরকে তারা নিচুজাত বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসে রামানন্দ পণ্ডিতের ফটিককে দেওয়া উত্তরের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে—

> ''তুমি হচ্ছ যবন আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে, ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে? গায়ে বামুনের রক্ত আছে যে। ধম্মটা বজায় রাখতি হবে তো?'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৯][২৯]

ধর্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের নিজেদের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল, তার ফল ছিল সুদূর প্রসারিত এবং মারাত্মক। আমরা আগেই বলেছি বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। তারা বেশির ভাগই ধীরে ধীরে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছিল। তার প্রধান কারণ হিসেবে একদিকে ছিল জীবিকার প্রয়োজন অন্যদিকে ছিল শিক্ষা। যে শিক্ষা গ্রামীণ অন্ধকুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে ছিন্ন করে আলোর পথ দেখাবে। আর একমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজে নারীদেরকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে। যেমন—রোকেয়া এস রহমান নিজেকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ধর্মের অন্ধসংস্কারকে অস্বীকার করে শিক্ষাকেই বেছে নিয়েছিলেন জীবনের একমাত্র পাথেয় হিসেবে। তিনি বলেছিলেন—

> এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানেই নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ সতীদাহ। যেখানে ধর্মবন্ধন, শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত আছেন। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে। [প্রেম নেই, পৃ. ১০৭][৩০]

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই, ''যেদিন থেকে ফটিক বুঝতে পেরেছে তাদের সমাজে নারীজাতিকে কোনও সম্মান দেওয়া হয় না, এবং এটা ঠিক সামাজিক ন্যায় বিচারের মধ্যে পড়ে না, সেদিন থেকেই সে ঠিক করেছে তার বিবিকে সে শুধু তার বিবি বলে নয়, মানুষ বলেই গ্রহণ করবে। সে আর বিবি হবে সমান।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৭][৩১]

ধর্ম মানুষকে আর মানুষ রাখল না, তাকে এক মনুষ্যত্বহীন জীবে পরিণত করে তুলল। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজের আসল ব্যাধি মৌলবী আবু তালেবের মতো মানুষেরা খুঁজে বের করেছিল। তার জন্য তাঁরা বাংলার হিন্দু সমাজকে এর জন্য দায়ী করেননি। সমাজে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদেরকেই দায়ী করেছেন। যেখানে দেশের পর দেশ, জাতির পরর জাতি উন্নতির পথে ছুটে চলেছে, সেখানে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ছে কেন? সেকথা বলতে গিয়ে মৌলবী আবু তালেব বলেছেন—

> যে বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস, এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই, তবু কেন তবু কেন এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে, ভ্রাতঃ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, একই বঙ্গের, একই অবস্থাপন্ন হিন্দু মুসলমানের কার্যের সমালোচনা করিলে হৃদয় বুঝিতে পারে মুসলমান কত অলস, কত কর্মবিমুখ। আজ হিন্দুদের শত শত কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হইতেছে আর মুসলমানের কিছুই হইতেছে না। এজন্য আমরা হিন্দুকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ নিজের বলবীর্যের উপর আমাদের আত্মনির্ভরতা নাই। আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতা হারা, অথচ সম্মান পাইবার অভিলাষী। হিন্দুদিগের বর্তমান কার্যকলাপ আমাদের অনুমোদিত না হইলেও তাঁহাদের অনেকের অধ্যাবসায় স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশভক্তি, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলী আমাদের অনুকরণীয়। তাহাদের একদল লোকের বেয়াদপি, বাচালতা মিথ্যাবাদিতা ভণ্ডামি, পরজাতি বিদ্বেষ, কূটিলতা প্রভৃতি দোষগুলি অবশ্যই বর্জনীয়।...হিন্দু নেতাগণ যেরূপ কঠোর উদ্যম ও যত্ন সহকারে চেতনা সঞ্চারের জন্য সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছেন, যদি মুসলমান সমাজের অগ্রণীগণ ইহার ষোল ভাগের একভাগ এমনকি শত ভাগের এক ভাগ করিতেন, তবে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত। ভাই মুসলমান! আইস, আজ একই কেন্দ্রে আমরা একত্রিত হই, একই মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত

হই, ভাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ, ভাই স্বজাতি হিতচিকীর্ষু! আইস, আজ অসময়ে মায়ের সেবা করিয়া প্রকৃত সন্তানের কাজ করি।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩][৩২]

তিনি 'বঙ্গের মুসলিম' সমাজের পিছিয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তবে রাজনীতির স্তরে নবীন এবং তরুণ শিক্ষিত মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের একটা প্রবল জোয়ার এসেছিল। শিক্ষিত এবং নতুন গজিয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে প্রকৃত মুসলমান হয়ে ওঠার বাসনা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারা নিজেদের প্রকৃত শিকড়ের সন্ধান করতে থাকে। তারা মনে করেন—

যারা স্বীকার করে আমরা এদেশের। আমাদের পূর্বপুরুষ হয় হিন্দু, নয় বৌদ্ধ। মানুষের অধিকার পাব বলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, হ্যাঁ স্বেচ্ছায়। এইটাই তো ভারতের রীতি। তারা? এদেশে তাদের স্থান কোথায়? আবহমানকাল ধরে তো ভারতে ধর্মান্তর গ্রহণ করে চলে আসছে এবং বহুক্ষেত্রেই তা স্বেচ্ছায়। অনার্যরা আর্য আচার ও ধর্ম গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রহণ করেছে হিন্দুরা। আফগান বা ইরানী বা তুর্কী বা মোঘল বিজেতারা আসবার বহু আগেই আরব বণিকদের বাণিজ্য পোতে সওয়ার হয়ে ভারতে এসেছিলেন বুজরগ্ মুসলমান প্রচারকের দল। তাঁদের হাতে ছিল পবিত্র কোরাণ এবং তরবারি নয়, তাঁদের কণ্ঠে ছিল জাতিভেদের পাঁতি নয়। মনুষ্যত্বে উদ্‌বোধনের বাণী—সাম্য শান্তি ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫][৩৩]

কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের নীতি নির্ধারকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। আবার বাংলাদেশে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তত মাথা চাড়া দিয়েছে। মানবতাবোধের অন্তর্জলী যাত্রা ঘটেছে। মানসিকতা বা মনোবৃত্তির কোনও পরিবর্তনই ইংরেজি শিক্ষা করতে পারেনি। শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ এবং বিদ্বেষের রাজনীতির বীজ বপন করেছিল। মুসলমানেরা হিন্দু জাতকে বিশ্বাসঘাতকতার জাত বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, 'হিন্দুগের ইতিহাস স্বদেশের পিঠি ছুরি মারার ইতিহাস। সৎসাহস নেই। মনে অ্যাক মুখি অ্যাক। হিপোক্র্যাটস্।" [পৃ. ২৬৩][৩৪] বাংলাদেশে ইলেকশন যত এগিয়েছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। উপন্যাসে দিগম্বরবাবুর কথা, 'ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে, মুসলমান ছোঁড়াগুলো তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে।' [পৃ. ২৬৩][৩৫] তিনি চেয়েছিলেন, 'মুসলমানরা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পরিত্যাগ করুক। তারা জাতীয়তাবাদী হোক। ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মানুক। বন্দেমাতরম মন্ত্রে উদবুদ্ধ হয়ে উঠুক।' [পৃ. ২৬৪][৩৬] মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলিম যুবকেরা খালি নিজেদের সুবিধের কথাই ভেবে গেছে। অন্যদিকে মুসলিম যুবক শফিকুল ভেবেছে সমগ্র দেশের কথা—''যেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শতকরা আশি নব্বুই জনের হাঁড়ি চড়ে না, যাদের পরনে ট্যানা জোটে না এবং যারা ভুগছে নানাবিধ রোগে। এদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হবে না।" [পৃ. ২৭৭][৩৭] এর মধ্যে যুক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থসর্বস্যতা। কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের অবিশ্বাস চিরকালের। কংগ্রেস পার্টির বেশিরভাগ নেতাদের কাছে হিন্দুদের স্বার্থটাই ছিল দেশের স্বার্থ। শফিকুল তা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ে—''বাংলার কংগ্রেস হিন্দু জমিদার মহাজনের স্বার্থ রক্ষার দিকেই দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ছে। এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে কংগ্রেস ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে।" [পৃ. ২৭৮][৩৮] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত ছিল চাকরি ও রাজনীতি এই দুটোকেই কেন্দ্র করে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিমদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার পথ জুড়ে হিন্দুরাই দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ হিন্দুরাই হচ্ছে মুসলিমদের শ্রেণি শত্রু। মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্রমশ ভাবিয়ে তোলা হল—

বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু কয়েদী মুসলমান, খেলোয়ার হিন্দু দর্শক মুসলমান। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০][৩৯]

বাংলার সমাজ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বমূলক পরিবেশকে হিন্দু মুসলিমের মিলনক্ষেত্র রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। সে কথাই উপন্যাসের মেজোবাবু শফিকুলকে বলেছিল—

> দেশ থেকে অভাব, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা এবং নিরানন্দ দূর করার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেই সহযোগিতার আহ্বান আছে। মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হবে সেখানে, যেখানে কর্মের উদ্যোগ আছে। উপর থেকে রাজনীতির যাদুদণ্ড নেড়ে এ কাজ সমাধা করা যাবে না। নিজেকে যুক্ত করতে হবে কর্মের সঙ্গে এবং কাজ শুরু করতে হবে নিচের থেকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০][৪০]

তিনি বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পাবে, জল আরো ঘোলা হবে। তার কারণ হিসেবে তিনি যে কথা বলেছেন সেগুলি হল—

''হিন্দু আর মুসলমান, এদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা যত বাড়বে, সাম্প্রদায়িকতাও তত বাড়বে। কারণ হিন্দু আর মুসলমান এই দুই শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হবে চাকরি আর রাজনীতির সীমাবদ্ধ পরিসরে। এই গুঁতোগুঁতি কেবল চেয়ার দখল নিয়ে। হয় কেরানীর চেয়ার আর না হয় মন্ত্রীর চেয়ার। এই তো। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে, চেতনাকে, বোধকে দেশের বৃহত্তর আঙিনায় প্রসারিত করে না দিই, সমগ্র দেশকে যদি দারিদ্র্য অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং নিরানন্দের কবল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে না যাই, তেমন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ না করি, এবং তাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্য সুযোগ আদায়ের যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু আর মুসলমান শুরু করেছে, এর মধ্যে কোনও কল্যাণ আমি দেখতে পাইনে, এ বিভেদকেই বাড়িয়ে দেবে। এবং এমন একদিন আসতেও পারে যেদিন হিন্দু মুসলমানের গলায় আর, মুসলমান হিন্দুর গলায় সত্যি সত্যিই ছুরি বসাতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু তাতেও কি এ সমস্যার সমাধান হবে ফটিক? না। কারণ চাকরির সংখ্যা কখনোই অসীম করা যাবে না, রাজনৈতিক মসনদের সংখ্যাও না।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০][৪১]

মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে একে অপরের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে থাকে। এই দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে ফকির, মোল্লা, মৌলবীরা। তাঁরা বলতে থাকেন—

> হিন্দু কাফের। তাকে চিনতে বা চেনাতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু মোনাফিক। ওরা আরও খারাপ। ওরা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু সুন্নত পালন করে না, শরা-শরীয়ত মানে না, মোল্লা-মৌলবী নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। ওরা আরও সাংঘাতিক। ওরাই আসল বদমাইস। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৩][৪২]

মুসলিমরা দুটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যায়। (ক) গোঁড়া মুসলিম, (খ) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম। মোল্লা-মৌলবীগণ বলে বেরাতে লাগলেন—

> (ক) ভাই মুছলমান! এই আযাব আসতিছে। সাবধান। সাবদান। মোনাফিকীর শরীক হয়ো না। কিডা মোনাফিক? তাগের দেখতি কী রকম? দেখতি তারাউ মুছলমানের মতো। কতাবার্তা খুব মিঠা মিঠা। তারাউ মিটিং করে। তারা মুছলমানেরে ভাগ কত্তি চায়। আরে মুছলমান মুছলমান। সব মুছলমানই আল্লার বান্দা। তার আবার উঁচু নিচুঁ কী? জমিদার পিরজা কী? আম গাছ আম গাছ। তার আবার উঁচু নিঁচু কী? উঁচু ডালে আম ঝোলে, আল্লাহই অ্যামনধারা বানাইছেন, তাই বলে কি একথা কওয়া যায় যে আমগাছের ঐ ডগার দিকটা আমগাছ নয়? ক্যাবল গুড়ার দিকটাই আমগাছ? জমিদার যদি আল্লাহর বান্দা হয়, সে কি মুছলমান নয়? এই কথা ধন্ধ ধরাবার কথা। এই কথা মোনাফিকের কথা বেঈমানের কথা। আল্লাহই সব কিছু পয়দা করিছেন। ভাই মুছলমান! খেয়াল কর। খেয়াল কর আল্লাহর কথা। নিশ্চয় আমিই তাহাকে পথ দেখাইয়াছি, এই অবস্থায় যে, সে হয় শোকরদার অনুগত (মুছলমান) হইয়াছে অথবা নাফরমানু কাফের হইয়াছে। তালি বুঝে দ্যাখ, মুছলমানগের মধ্যি কারা জমিদার আর চাষীর ছওয়াল তুলতিছে। আল্লাহ কতিছেন হয় শোকরদার অনুগত থাক অর্থাৎ মুসলমান থাক, আল্লাহর রাস্তায় থাক আর না হয় নাফারমান কাফের হও। এর মধ্যে ভেদাভেদ, জমিদার, চাষী, বড়লোক,

গরিব, এ তো আল্লাহর কথা নয়, তালি এই ছওয়াল ওঠে ক্যান্? তোলে কিডা? কারা?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪][৪৩]

(খ) মৌলবী অত্যন্ত উল্লসিত। এতেও মোনাফিকরা রেহাই পাবে ভেবেছো? ব্যাটারা কী আন্দাজ বদমাইসি শুরু করেছে। যা নয় তাই বলে যাচ্ছে আল্লাহর পথে যারা আছে, যারা অন্যদেরও রাখতে চায় আল্লাহর পথে, সেই তাদের বিরুদ্ধে। বলে কি, এই মোল্লা মৌলবীরা নিজের গোস্ত রুটির ব্যবস্থার জন্যই এ কাজ করছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। পাজী! বদমাইস। আল্লাহর নাম ছড়ায়ে বেড়াচ্ছি নিজির গোস্ত্ রুটির ব্যবস্থা করার জন্যি! পাজী! দোযখী সব! [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪][৪৪]

'ইসলাম বিপন্ন' এই স্লোগান তুলে তারা প্রচার করতে লাগল—

ভাই মোছলমান! আপনারা সবাই জানেন, আজ ইসলাম কী আন্দাজ বিপন্ন। আমরা মসজেদে নামাজ পড়ব, সেখেনে কাফেরগের বাজনা বাজবে। আমাগের ইচ্ছেমত আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি করব, না আমাগের তাউ করতি দিয়া হবে না। কোন্ পশু আমরা জবেহ করব, তা নাকি আমরা ঠিক করতি পারব না। তা ঠিক করে দেবে কাফেররা। এই তো এখানকার মুছলমানগের অবস্থা। মুছলমানদের কাছে সব চাইতি বড় হল ধর্ম। সব চাইতি বড় হল ইছলাম। ইছলামের স্বার্থ। আমরা ইছলামের ঝাণ্ডা উঁচু রাখবার ইরাদা করেই আপনাদের কাছে ভোট চাতি আইছিলাম। ইছলামের ঝাণ্ডা উঁচু রাখবার জন্যিই ভোট আপনারা দেছেন।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩২৫][৪৫]

অর্থাৎ ধর্মকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৎপর হয়েছিল।

ধর্ম অখণ্ড রাষ্ট্রকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করে কাঁটা তারের সীমানা নির্দেশ করেছিল। ঠিক একই রকমভাবে আমাদের সমাজ হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়ের দুটি মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে কাঁটাতারের সীমানা নির্দেশ করেছিল। 'দেশ মাটি-মানুষ' এপিক উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে অমিতা ও শামিমের সম্পর্কের পরিণতি না হওয়ার মূলেই ছল দুটি ভিন্ন ধর্ম। দেশ ভাগের যন্ত্রণা যেমন দুই দেশের মানুষ আমৃত্যু বয়ে নিয়ে চলেছে, ঠিক একইরকমভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদের যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এর আগে 'প্রেম নেই' (দ্বিতীয় খণ্ড) উপন্যাসখানিতে মুসলিম সমাজের নানা অন্ধকার দিক ও তার পাশাপাশি হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের নানা দ্বন্দ্বের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে মুসলমান সমাজের ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপিত হয়েছে। যেমন—শামিমের সঙ্গে অমিত সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পিছনে তার বাবাই প্রধন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা অমিতার কথায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে—

শামিমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন ভেঙে গেল, তখন তুমি তো নিশ্চিন্ত হয়েছিলে? তুমি শামিমকে নিশ্চয় বলেছিলে বাবা, 'হিন্দু-কালচার আলাদা, মুসলিম কালচার আলাদা। এ দুইয়ে কখনও মিল হবে না। এতে আমার মেয়ের ঘোর অমঙ্গল হবে। সেই কারণেই শামিম, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।...তুমি জানতে এ কথা ঠিক নয়।" [পৃ. ৫০-৫১][৪৬]

হিন্দুর মনে মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আবার মুসলমানের মনে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব প্রতি মূহূর্তে সঞ্চারিত হত। একই দেশে কম করে একে অপরের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে তার প্রতি অমিতার কটাক্ষোক্তি—'হায়রে ভারতবর্ষ, কতকাল আর নামের পাশে ধর্মে সাঁটা লেবেল দিয়ে মানুষ চিনবে?' [পৃ. ১১৬][৪৭] অন্যদিকে শামিম বহলকিকে (অমিতা) বলেছিল—'মুসলিম নেতারা বুঝতে পারছেন না, লোকের মনে কেবলই ঘৃণা ছড়িয়ে কারও কোনও মঙ্গলই তাঁরা করতে পারবেন না।' [পৃ. ১১৬][৪৮] কিন্তু এই হিন্দুরাই কোরাণের অনুবাদ করেছে, মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছে। এটাই ছিল ভারতবর্ষের কসমোপলিটন কালচার। যা বাঙালির স্বাভাবিক ঐতিহ্য। বাঙালি সমাজ একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। সেই বাঙালি আজ অতীত ঐতিহ্যের তল্পী বহন করে চলেছে। আর বাঙালির এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করতে গিয়ে হাসেম সাহেব বলেছিল—

বাঙালি আর কস্‌মোপলিটান দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে অখণ্ড ভারতীয়ত্বের কাল্পনিক ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। বাঙালি হিন্দু এখন ভারতীয় জাতিতত্ত্বের মহিমাকীর্তনে ব্যস্ত। তার নেতা এখন গান্ধী, জওহরলাল, বল্লবভভাই। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমান জোট বাঁধার চেষ্টা করছে পশ্চিমা মুসলমান নেতাদের সঙ্গে। পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছো তাদের একচ্ছত্র নেতা বলে জিন্নাকে মেনে নিয়েছে। এদের বাঙালি হিন্দু কতটা ভারতীয় হবে বা বাঙালি মুসলমান কতটা পাকিস্তানি হয়ে উঠবে, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। কিন্তু বর্তমান যে দিন দিন বাঙালি হিন্দুর এবং বাঙালি মুসলমানের কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠছে, এটাই আশঙ্কার কারণ। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২][৪৯]

এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে শামিম বলে ওঠে—

আজ হিন্দু আর মুসলমানকে আপন ভাবে না, মুসলমানও ঠিক করে ফেলেছে যে, হিন্দুই তার শত্রু। এর কারণেই কাজ এত বিদ্বেষ এত ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘৃণা যে সন্তানের জন্ম দেয়, সে কি কারও কোনও কল্যাণ করতে পারে? [তদেব, পৃ. ১২২][৫০]

মুসলমান সমাজ নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। তারা হিন্দুদের সমস্ত কাজকেই মুসলিম বিদ্বেষ বলে মনে করতে থাকে। 'আজ আমাদের দেশে মুসলমান থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে।' [পৃ. ১২৩][৫১] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

একদিকে ধর্মের গোড়ামি আর একদিকে আচার বিচারের গোঁড়ামি, হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে রেখেছে এই ঘটনা। মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমানেরা খেপে যাবে, অতএব বাজাও মসজিদের সামনে বাজনা। সেটাই ধর্ম পালন। প্রকাশ্য স্থানে গো কোরবানি করলে হিন্দুরা ধর্ম নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করে, তবে করো প্রকাশ্য গোরু জবাই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩][৫২]

এই তো হয়ে দাড়িয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম পালনের কর্তব্য। কিন্তু যুগে যুগে ভারতবর্ষে কবীর নানক দাদু রজ্জব সমস্ত সন্ত-সাধুরা চেয়েছিলেন মানুষকে তার ধর্মীয় খোলস থেকে বার করে আনতে। এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাতে। এই সম্পর্কে সমাজে একটি গল্প বা লোককথা প্রচলিত আছে।

''ইসলামে উপাস্য তো অলখ নিরঞ্জন। তিনি জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত। তাঁর মহিমাকে অন্তরে উপলব্ধি করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এই যে মসজিদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা, এটাও কি এক ধরনের পৌত্তলিকতা নয়? যে অলখ নিরঞ্জন তাঁকে উপলব্ধি করার যে উপাসনা তার জন্য মসজিদ লাগবে কেন? যে কোনও জায়গাতেই তাঁর উপাসনা চলতে পারে। একজন সন্ত একবার মসজিদের দিকে পা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এক ভক্ত এসে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনার কি আক্কেল নেই। মসজিদের দিকে পা বাড়িয়ে শুয়ে আছেন? পা সরান। সন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদে কী হয়? ভক্ত বললেন, আল্লাহর উপাসনা হয় জানেন না? সন্ত বললেন, আমি তো জানি, তুমি জান কিনা সেটাই হল প্রশ্ন। আচ্ছা ভাই তাহলে তুমি অনুগ্রহ করে আমার পাটাকে এমন দিকে ঘুরিয়ে দাও, যেদিকে আল্লাহ নেই। আমরা পৌত্তলিকতা মানিনে বলে দাবি করি কিন্তু আমরা মসজিদ মানি। মহাজ্ঞানী এবনে রোশদ্ বলেছেন, অধিকাংশ ধর্মই পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র। ...ধর্মের সত্য আমার কথার মানিয়ে কিন্তু কোনও বিশেষ রূপ আমি স্বীকার করতে পারিনে। কি আশ্চর্য! মানুষ মন্দির ভেঙে গির্জা গড়ছে, গির্জাকে ভেঙে মসজিদ গড়ছে খোদার সান্নিধ্য পাবে, এই আশায়। যে অনন্ত অনাদি পরাৎপর বিশ্বের অণুতে অণুতে তরঙ্গায়িত হচ্ছে, প্রতি আত্মার নিভৃত কন্দরে যার স্পন্দন জাগছে, তাঁর সান্নিধ্যের জন্য এত গণ্ডির প্রাচীর দাঁড় করানোর প্রয়োজন কী? ...বাংলার মুসলমানেরা যদি ইমান কি তা সত্যই বুঝ,, তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নামে এত দাঙ্গা ফ্যাসাদে যেত না। তবে বুঝত আল্লাহই একমাত্রপবিত্র, মসজিদ নয়।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩-১২৪][৫৩]

কিন্তু মুসলমান সমাজ ধর্মের গভীর সত্যটা বুঝতে পারেনি। ঠিক একই রকমভাবে হিন্দু সমাজও অন্ধ ধর্মান্ধতাকে আঁকড়ে ধরেছিল। এবিষয়ে হাসেমসাহেব বলেছেন—

হিন্দু যেদিন থেকে আপন হিন্দুত্ব নিয়ে গৌরব করতে উদ্যত হল, তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মেনে নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকত তবে হিন্দু খুব খুশি থাকত সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হয়ে উঠল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রবল হতে চায় না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৪][৫৪]

তিনি আরও বলেছিলেন—

আজকের হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের তীব্রতা বেড়েছে এবং এটা আমাদের ভুল পলিটিক্সের জন্য। কিন্তু পলিটিক্স্ হিন্দু মুসলমানের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে, এটা ভুল। বা ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে, শুধুমাত্র এই কথা বলাটাও ঠিক নয়। হিন্দু মুসলমানে একটা বিরোধ ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেছে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩][৫৫]

কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারা প্রচার চালিয়ে যেতে লাগল 'মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল।' [পৃ. ১২৬][৫০] ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে দিন দিন হিংস্রতার জন্ম নিতে লাগল। এ প্রসঙ্গে শামিমের মুখ দিয়ে লেখকের উক্তি, 'হিংসার ঔরসে যে সন্তানের জন্ম সে কারও কল্যাণ করতে পারে না।' [পৃ. ৩৪৫] অর্থাৎ ধর্মকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল। এই দ্বন্দ্বের কারণ আমরা উপন্যাসটিতে সুধাকরবাবু ও অমিতার বাবার কথার মধ্যেই খুঁজে পাই। সুধাকরবাবু মনসুরকে বলেছিলেন—

স্বাতন্ত্র্যবোধ বিশ্ববোধের সঙ্গে মিলুক, মুসলমানেরা, বিশেষত বাংলার জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন কোনও মুসলমানই এতে আপত্তি করেনি। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু নেতাই মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে তো আমল দিতে চাননি। এ কথা অস্বীকার করা যায় কি? এই সব হিন্দু নেতা হিন্দু মুসলিম দুই সামাজিক পৃথক মত 'এক দেহে লীন হোক' এটাই চাইতেন। কিন্তু লীন হয়ে কী হবে, সে সম্পর্কে কোনও পরিষ্কার ধারণাও তাদের ছিল না। [পৃ. ১৬৭][৫৬]

সুধাকরবাবুর কথায় প্রত্যুত্তরে অমিতার বাবা বলেছিলেন—

''হিন্দু সমাজের কাঠামো এত থাকে থাকে বিভক্ত যে, বাইরের সম্প্রদায়কে এই কাঠামোর মধ্যে ঢোকালে তাকে কোন্ থাকে জায়গা দেওয়া হবে, সেটাই তো জানা যায়নি। জন্ম দিয়েছ যেখানে উঁচু জাত নিচু জাত নির্ণয় করা হয়, সেখানে, সেই সমাজে মুসলমান যদি ঢুকতে চাইত, তাকে কোন্ সারিতে স্থান দেওয়া হত। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭][৫৭]

অর্থাৎ যে সমাজটা ছোঁয়াছুঁয়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমাজে মুসলমানের স্থান কোথা হবে, সেটাই সব থেকে বড়ো প্রশ্ন। অন্যদিকে মুসলমানেরা সমাজে অচ্ছ্যুৎ অস্পৃশ্য হয়ে থাকতে চাইবে না। অন্য ধর্মের উদাহরণআমরা যতই দেখাই না কেন, ব্রাহ্মন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন পার্শি গুর্খা এবং শিখেরা হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানেরা ছিল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাংলার মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে উপন্যাসটিতে তায়েব কাকা বলেছিলেন—

বাংলার মুসলমানের অবস্থা আজকে না ঘরকা, না ঘাটকা। শত শত বছর ধরে মুসলমান এ দেশে আছে, আমরা তো এই দেশেরই মানুষ। তবু দেখ ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি যেন আরবের খড্ডুর বন আর পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জেই নিবদ্ধ। ফলে ভারতীয় বলে সে নিজেকে ভাবতে পারছে না। অথচ আরবি পারসিও হতে পারছিনে আমরা। মাতৃভূমি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে আমরা কি নিতে পেরেছি? কেন মুসলমানটা এটা ভাবতে পারে না?...রাস্তা দিয়ে হিন্দু মুসলমান যুবকেরা যখন চলে, হিন্দুদের চলাফেরার কায়দা দেখ, বলে দিতে হয় না যে, তারা নিজের দেশের মাটির উপর দিয়ে হাঁটছে, দেশ যেন তাদেরই। আর মুসলমানেরা এমনভাবে চলে তারা যেন এখানকার মুসাফির। এই হতভাগা ''কত্তম'' কি এখনও ভাববে না, বাংলা যদি তার দেশ না হয় তবে সে কি শূন্যে বাসা নির্মাণ করবে? [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৯][৫৮]

মুসলমানেরা বরাবরই নিজেদের দেশের চাইতে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিকেই বেশি আপন বলে মনে করত। কারণ তাদের মধ্যে নিজেদের দেশ ও কার্য সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ছিল না। আর এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। বাংলার মুসলমানদের দুর্গতির পিছনে এটিই ছিল প্রধান কারণ। বাংলার ধনী মুসলমানেরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিয়ে, তারা মসজিদ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা দেশকে পর করে দিয়েছে এবং মাতৃভাষাকেও ঘৃণার চোখে দেখেছে। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে বাঙালির মুসলমানদের নিবিড় পরিচয় থাকত, তবে তাদের দেশপ্রেম অন্তরে জাগরিত হত। দেশভাগের ট্র্যাজেডির মূলে ছিল মূসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামি। এই সম্পর্কে তায়েব কাকার মন্তব্য—

> ভারতের মুসলমানরা এই যুগে ছিল কার্যত এক দেশহীন ধর্মসম্প্রদায় মাত্র। নিজের দেশকে অবস্থা বৈগুণ্যে এরা হিন্দুর দেশ মনে করত। কেউ কেউ 'দারুল হর্ব' ছেড়ে পশ্চিমে দারুল ইসলামে হিজরত করার কথাও ভাবতেন। কাজেই এই ''হিন্দুর দেশ'' হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তারা ভাবতে যাবে কেন? এই দেশ যে তাদের, এই দেশ শাসন করার অধিকার ও দেশের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব যে তাদের, তাদেরই ভাইয়েরা যে কৃষক-মজদুর হিসাবে দেশের খোরাকি ও অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি করছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এ কথা যেন তাদের মনেই পড়ত না। কাজেই দেশগত প্রাণ, দেশের জন্য যে-কোনও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, পরাধীনতার জ্বালায় দগ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হিন্দুরা যদি মুসলমান নেতাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করেও থাকে, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭০][৫৯]

ধর্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 'চা', 'জল'ও ভাগাভাগি হয়েছে। 'হিন্দু-মুসলমানে আমরা চা ভাগ করেছি, জল ভাগ করেছি। সেখানে দেশ ভাগ হবে, এ আর বেশি কথা কি?' [পৃ. ২৯৬][৬০] হিন্দু পানি পাঁড়ে মুসলমানকে জল দিত না। মুসলমান পানি হিন্দুরা তো ছুঁতোই না।' [পৃ. ২৯৬][৬১] লেখক শুধুমাত্র এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদটাকেই দেখিয়েছেন তাই নয়, পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদটাকেও খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখিয়েছেন। অমিতার (ফুলকির) বাবা এই বিষয়ে বলেছেন—'হিন্দুরা ভাতের হাঁড়ির আর জলের কলসি, স্পর্শদোষ থেকে এই দুটো জিনিসকে বাঁচাতে গিয়েই দেশটাকে ভাগ করে ফেলল।' [পৃ. ৩০০][৬২] তিনি আরও বলেছেন—হিন্দুরা সবসময় হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে ঘোরে। একটা বড়ো এবং একটা ছোটো। বড়ো গ্লাসে শুধু তারা ব্রাহ্মণকেই জল দেয়। আর ছোটো গ্লাসে সে শুধুমাত্র অব্রাহ্মণকেই জল দেয়। তাহলে হিন্দু জলেও ভাগ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু সমাজের মধ্যেও একটা বিরাট ভেদ লক্ষ করা যায়। আর সেই ভেদকে এড়িয়ে কীভাবে জাতীয় ভাবের সৌধ গড়া হবে? সেটাই ছিল হিন্দু সমাজের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

> শিক্ষিত হিন্দু সব সময়ে দুটো জগতে বাস করেছে। একটা তার ভাবনার জগৎ, আর একটা তার আচার আচরণের জগৎ। তার সংস্কারের জগৎ। তার ভাবনার জগৎটা গড়ে উঠেছিল, খানিকটা উপনিষদের উদার ভাবধারা দিয়ে, আর অনেকটাই ইওরোপের মানবতাবাদী চিন্তা ভাবনায় পরিপুষ্ট হয়ে। এটা শিক্ষিত হিন্দুর প্লাস পয়েন্ট। আবার এটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে মনু-রঘুনন্দনের সমাজব্যবস্থার কঠোর ভেদনীতি। এটাই হল হিন্দুর আজন্ম লালিত সংস্কার। যে সংস্কার মানুষকে মানুষের মূল্যে গ্রহণ করাকে পাপ বলে মনে করে। স্বীকার করে যে, মানুষের মূল্য স্থির হবে তার জন্মগত অবস্থান দিয়ে। যে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছে সে ব্রাহ্মণই থেকে যাবে আর যে শূদ্রের ঘরে জন্মেছে সে শূদ্রই থেকে যাবে। সে অস্পৃশ্য। শিক্ষিত হিন্দু এই সংস্কারের নাগপাশে আজও বন্দি হয়ে আছে। এই কাঠামোতে জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না। জাতীয়তাবোধ জন্মই নিতে পারে না। আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা এই হিন্দু সংস্কারকে নির্মূল করতে পারেননি। হিন্দু সমাজের ভেদনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোটাকে ভেঙে চুরমার করতে পারেননি।....
>
> ...সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যারা তারা হিন্দু সমাজের এই ভেদনীতির শিকার। তারা হিন্দু সমাজের ঘৃণার শিকার। এই ঘৃণা হিন্দু মনের এমন গভীরে বাসা বেঁধে আছে যে, অধিকাংশ হিন্দু এ সম্পর্কে সচেতনই নয়। এ সম্পর্কে তাই কোনও পাপবোধও নেই তাদের মনে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪][৬৩]

হিন্দুদের এই ভেদনীতি সম্পর্কে মৌলানা আজাদ বলেছিলেন 'গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদই মানুষকে এবং দেশকে পবিত্র এবং অপবিত্র ভাগে ভাগ করে। এটা ইসলামের মূল সত্তাকেই অস্বীকার করে। ইসলাম এই বিভাগকে মানে না।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪][৬৪] অর্থাৎ ইসলামি তত্ত্বের দিক থেকে পাকিস্তান ছিল অসিদ্ধ। বাস্তবে পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে মেনে নেননি। কিন্তু মুসলিমের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে তিনি খারিজ করেননি।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে হিন্দুদের সিডিউল কাস্টদের কথা উঠে আসে। তারা বর্ণ হিন্দু শাসিত সমাজে সংখ্যালঘু। কিন্তু তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কোন্ ধর্মীয় ভিত্তিতে ধার্য করা হয়েছিল। এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেই তেমন ওয়াকিবহাল ছিল না। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে অমিতার (ফুলকি) বাবা বলেছেন—

> ইংরেজ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সিডিউল কাস্টকে উস্কে দিয়েছে, এটা আমি মেনে নিতে পারিনি। বর্ণহিন্দু শাসিত সমাজে এদের পরিচয় ছিল, এরা শূদ্র। এরা জন্মসূত্রে দাস। দাস হওয়াটাই ওদের কর্মফল। অতএব শূদ্রদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে উচ্চবর্ণের দাস হয়ে থাকতে হবে। না হলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে। এই অমানুষিক ধর্মীয় নীতি হাজার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে। এটা যে মানব ধর্মের বিরোধী এটাও কখনও বর্ণহিন্দু সমাজের মনে হয়নি। কারণ এই দাসগুলো না থাকলে ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দু সমাজের ভিতটাই যে ধসে যায়। এরা তাই হাজার হাজার বছর ধরে নীরবে উপরতলার প্রভুদের সেবা করে এসেছে। ওটা নাকি ওদের কর্মফল। অত্যাচার নিপীড়ন অসহ্য হয়ে উঠলে এদের অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেছে, ইসলাম এলে এরাই ইসলামকে বরণ করে নিয়েছে। ইংরাজের রাজত্বে এরাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ইংরাজ এসেই ভারতে প্রথম সেকুলার আইনের প্রবর্তন করে। ইংরাজ রাজত্বেই আমরা সেকুলারের শিক্ষা পাই। তাই এতদিন পরে এদের মুখে কিছু ভাষা ফুটেছে। আর তাইতেই গেল গেল রব উঠেছে আমাদের সমাজে। আজ এরা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলেছে।
>
> ওদের দাবির ভিত্তি কি ধর্ম?
>
> ওদের কী ধর্ম তা কি ওরা জানে? ওরা শুধু জানে যে, ব্রাহ্মণশাসিত ধর্মের নিগড় থেকে ওদের পরিত্রাণ পেতে হবে। মানুষের সমাজে ওদের মানুষের অধিকার পেতে হবে। ধর্ম নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। [পৃ. ৩০৮][৬৫]

সমাজে একই ধর্মের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদ প্রথম থেকেই ছিল। সমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদাভেদের চিত্র খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। ক্ষেমী বামনি ও মেথরানী চরিত্র দুটির মধ্যে দিয়ে। নিচু বর্ণের ছায়া উঁচু বর্ণের দাওয়ায় পড়লেও যেটা অমঙ্গল। যা ক্ষেমী বামনির কথায় স্পষ্ট—'ওর ছায়াটা ঘরে এসে আমার পিঁড়িটার উপর পড়ল যে।' তাই মেথরানীর ছোট মেয়েটিকে কুটনো কোটার পিঁড়িটা ছুঁড়ে মেরেছিল। আর সেই ক্ষেমী বামনিকেই দেখা যায় প্রায়ই একটা বিড়াল কোলে নিয়ে আদর করছে। সেই সম্বন্ধে তাকে কেউ কিছু প্রশ্ন করলে সে গুরুদেবের বিধানের কথা বলে—'বিড়ালের গায়ে লোম বস্তর আছে। তাই বিড়াল ছুঁলে দোষ নেই মেথর ছুঁলেই দোষ।' [পৃ. ২৩০][৬৬] অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজে আসল চেহারা। এ প্রসঙ্গে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''দুর্ভাগা দেশ'' কবিতাটির কথা স্মরণ করেছেন—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে
> বঞ্চিত করেছ যারে,
> মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
> ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে
> বিধাতার রুদ্ররোষে

দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।...[৬৭]

আমরা এতক্ষণ ধরে সমাজে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতার কাহিনি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করলাম। এবার আমরা শাস্ত্র অনুযায়ী দুই সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ বিধি এবং সেই আচরণবিধি অনুযায়ী সমাজে মানুষের অবস্থান বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব। আমরা এক্ষেত্রে প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থানকে দেখার চেষ্টা করব শাস্ত্র বিধি অনুসারে। এক্ষেত্রে অমিতার (ফুলকি) শামিমকে বলা কথাগুলি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সে বলেছে—

> তায়েবকাকা, মনসুর তোমরা বল, মুসলমানের কত গভীর বেদনার কথা বলার ছিল, কিন্তু শোনবার কান ছিল না। কান শুধু নয়, মনও শামিম। কথাটা সত্যি তো। এমন বেদনার কথা শূদ্রেরা, অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যেরা যুগ যুগ ধরেই তো শোনাতে চেয়েছে। তারাও তো শোনাবার কান, বা বুঝবার মন পায়নি। তেমনি তোমাদের কখনও মনে হয় না শামিম, কখনও মনে হয়নি যে, আরও একটা সম্প্রদায় আছে তোমাদেরই কাছে, একেবারে কাছে, সেই তাদেরও বেদনার কথা আছে। তারাও শোনাতে চায় তাদের বেদনার কথা। হাজার হাজার বছর ধরে তারা চেষ্টা করে আসছে তাদের কথা শোনাবার। তারাও তো শোনবার কান আর বোঝবার মন খুঁজে হন্যে হয়ে গিয়েছে। পায়নি না? তাদের কথা তারা কাউকে কোনও দিন শোনাতে পারেনি। এরা হচ্ছে নারী। নারীকে সম্প্রদায় বলবে কিনা এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে শামিম। কিন্তু এরা যে স্বতন্ত্র একটা জগতের বাসিন্দা সেটা কি করেই বা বোঝাই তোমাদের। জগৎ তো আসলে দুভাগে বিভক্ত। একটা পুরুষের জগৎ আর একটা মেয়েদের জগৎ। এইটেই আসল ভাগ শামিম। নারীর জগৎ বঞ্চিদের জগৎ। সে নারী হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খ্রিস্টিয়ান হোক কি যেই হোক। নারী মানেই বঞ্চিত। হিন্দু নারী-হিন্দুপুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার, মুসলমান নারী মুসলমান পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার, খ্রিস্টিয়ান নারী খ্রিস্টিয়ান পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার, অস্পৃশ্য নারী অস্পৃশ পুরুষ জগতের বঞ্চনার শিকার। সব চাইতে বড়ো বঞ্চনা নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার হরণ পুরুষের রচিত সমস্ত শাস্ত্র নারীর এই অধিকার হরণ করেছে শামিম।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩-১৮৪][৬৪]

অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষের রচিত শাস্ত্র নারীদেরকে কীভাবে ধর্মের অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে সেটাই আমরা দেখব উপন্যাসটিতে লেখকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষদের অভক্তি কেবল অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিত ও মোল্লাদের প্রতি। তাঁরাই শাস্ত্রের বিধিকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শাস্ত্রে কোথাও নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধন হল মোল্লা সমাজ। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, শিক্ষার আলো পেলে নারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, এবং পতিভক্তি কমে যাবে। ফলে তারা উপযুক্ত গৃহিণী বা উপযুক্ত মাতা হয়ে উঠতে পারবে না। বরং তারা যদি স্বামীর (পুরুষ) সমান সমান পরামর্শদাত্রী হয়ে ওঠে, এটি ছিল সমাজের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত পুরুষ সম্প্রদায়ের মূল ভয়। এছাড়া শিক্ষার আলো পেলে নারীদের মধ্যে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় এবং পতিভক্তি কমে যায়—এই ভয়েও পুরুষ শাস্ত্রকারেরা সব সময় ভীত থাকত। হিন্দুশাস্ত্র 'মনুসংহিতা' এবং মুসলিমদের 'কোরাণে' নারীদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোরাণের মুসলিম রমণীদের অধিকার সম্বন্ধে শামিম বলেছে—

১. পুরুষের যত অধিকার, নবী বলেছেন, নারীরও সেই অধিকার আছে।

২. নারী পুরুষের অংশ।

৩. নারীর অধিকার পবিত্র—তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।

৪. জগৎ এবং জগতের যাবতীয় বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু নারীরই সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান সামগ্রী।

অর্থাৎ কোরাণে নারীকে উচ্চস্থানে রাখা হয়েছে। ঠিক একই রকমভাবে হিন্দুদের মনুসংহিতাতেও নারীদেরকে উচ্চস্থানে রাখার কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে—

১. যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবগণ তুষ্ট হন ; যেখানে তাঁরা পূজিত হন না, সেখানে সব কর্ম নিষ্ফল হয়। (৩/৫৬)[৬৯]

২. যে বংশে কুল স্ত্রী দুঃখ করেন, সেই বংশে বিনষ্ট হয়। (৩/৫৭)[৭০]

৩. উৎসবাদিতে স্ত্রীলোককে অলংকার, বস্ত্র ও ভোজ্য দিয়ে সম্মান করতে হবে। (৩/৫৯)[৭১]

কিন্তু হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের নারীদের পালনীয় কর্তব্যগুলি মূলত ঠিক করত সমাজপতিরা। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অমিতার (ফুলকি) ঠাকুমার কথাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

> সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক, স্বামীর কোলে মাথা রেখে যেন মরতে পারি। অসতীনের ঘর করি, এরই জন্যিই তো এত কাণ্ড বউমা। এরই জন্যি তো আমাদের মেয়েদের এত উপোস কাপস, এত ব্রত পালন, সে ব্রেতর কি সীমা সংখ্যা ছিল? প্রতি মাসে এ ব্রেত সে ব্রেত, এবার সেবার লেগেই আছে, সবই তো নিষ্ঠাভরে পালন করে গিয়েছি আমরা। একটাও বাদ দিইনি। তা কি হল? পাকা চুল ফক্ ফক্ করছে কিন্তু সিঁদুর কোথায় গেল। অক্ষয় সিঁদুর ব্রেতর ফল কি হল? কাঁচকলা।
>
> ...সব ছেলে-ভুলোনো ছড়া বউমা। পুরুত বামুনেরা চালকলা খাবে বলে ওর সঙ্গে পুণ্যি জুড়ে দিয়েছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৩][৭২]

বুড়ির প্রসঙ্গ ধরে নানা ধরনের ব্রত কথার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। একটি ব্রত কথায় আমরা দেখতে পাই বংশের উত্তরাধিকার পুত্রের জন্ম দিয়ে স্বামীর কোলে স্ত্রীর মরণ হবে এইরকম ইচ্ছা প্রকাশহেতু ব্রত।

> পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা যে পূজেরে সকালবেলা।
> আমি সতী পুত্রবতী সাতভায়ের বোন ভাগ্যবতী।।
> ঢালি জল তুলসী বিল্বে স্বামী আদরিণী হব ফলে ফুলে।
> পুণ্যিপুকুরে ঢালি জল শ্বশুর কুলের হোক মঙ্গল।।
> এ ব্রতের ফল কি হয় নির্ধনের ধন হয়
> সাবিত্রী সমান সতী হয় স্বামী সোহাগিনী হয়
> পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হবে গঙ্গাজলে।। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৩][৭৩]

অন্যদিকে মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই প্রায় একইরকম চিত্র। মুসলিম সমাজের নারীদের পক্ষে আওরতে হাসিনা হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তা নবীর বচনে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। ফকির বলেছে—

> কোরানের বাণী আর নবীর বচন।
> মন প্রাণ দিয়া আরও শুন বিবিগণ।।
> যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে।
> কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে।।
> শতশত সাপ বিচ্ছু কাটিবেক তথা।
> দিবানিশি আগুনেতে জ্বলিবেক সেথা।।
> আরও কত কষ্ট তার নাহিক শুমার।
> সে সব কষ্টের কথা কি বলিব আর।।...

দেল জান দিয়া তাঁর মন যোগাইবে।

পতিরে প্রাণের চেয়ে মমতা করিবে।। [প্রেম নেই, পৃ. ৬][৭২]

অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা সমাজে প্রায় একই রকম। অমিতার (ফুলকি) কথার মধ্যে যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—

> সব মেয়েরাই সমান অসহায়। তুমি পুরুষ শামিম, তাই জান না। পুরুষের জগতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। কিন্তু মেয়েদের জগতে শুধু মেয়েরাই আছে। তারা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান নয়। তারা শুধুই মেয়ে। সব বঞ্চনার তারাই শিকার। [প্রতিবেশী, পৃ. ১৬৭][৭৫]

মেয়েদের জীবনেই সবসময় বিপর্যয় নেমে আসে। আমাদের সামাজিক ইতিহাসে বরাবর দেখা গেছে মেয়েরাই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং সেই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে তা নির্দ্বিধায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিনও পুরুষকে তার মৃত পত্নীকে কোলে নিয়ে বেহুলার ভেলায় ভাসতে হয়নি কখনও। পুরুষেরা বড়ো জোর স্ত্রীর জন্য তাজমহল গড়ে দিতে পারে। কিন্তু মৃত পত্নীর মাথা কোলে নিয়ে সারারাত নির্বান্ধব পুরীতে একা কখনও কাটায়নি। তাই সে তখনও বুঝবে না বন্ধুর সঙ্গলাভের ইচ্ছা আর কেনই বা নারীর মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে বন্ধুর সঙ্গলাভের ইচ্ছা। অমিতাকে (ফুলকি) বলা তায়েব কাকার উক্তিটি আমাদের সমাজ জীবনে সবথেকে সত্য বলে মনে হয়—

> মানুষের জীবনে মানুষের সঙ্গ না হলে চলে না, মানুষ মাত্রেই মানুষের প্রতিবেশী, তার জাত নেই ধর্ম নেই তার জ্ঞাত গোত্তর নেই। সে প্রতিবেশী। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬][৭৬]

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত লেখকের ট্রিলজি উপন্যাসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলাম। উপন্যাসগুলোর মধ্যে সমাজ-ধর্ম-সম্প্রদায়কে দেখার চেষ্টা করলাম। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সময়ে সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ অনুযায়ী মানুষের অবস্থান এবং নারী-পুরুষের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করলাম। এবার আমরা লেখকের অন্যান্য উপন্যাসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব। 'এই দাহ', 'মনের বাঘ', 'লোকটা', 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, 'দুজনে', 'এক ধরনের বিপন্নতা', 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসগুলো মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা। ফলে আমরা উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সমাজ-ধর্ম-সম্প্রদায়কে দেখার চেষ্টা করব। লেখকের 'দেশ-মাটি-মানুষ' এপিক উপন্যাসে আমরা এতক্ষণ যে সমাজের কথা আলোচনা করলাম, তা হল স্বাধীনতা-পূর্ব হিন্দু ও মুসলমান সমাজ। যে সম্প্রদায়দুটি একসময় নিজেদেরকে ভাই ভাই বলে মনে করত। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়া থেকেই সেই সম্পর্কের ভাঙন ধরতে থাকে। কীভাবে, কেন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চির ধরেছিল সেই সমস্ত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার সময় থেকে সমাজের চালচিত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। সেখানে ধর্ম নয়, অর্থ ও শিক্ষাই হয়ে উঠল সমাজে মানুষের অবস্থান মাপার একমাত্র মাপকাঠি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সময়কাল থেকেই পুঁজিই শহর-গ্রামের বাজার দখল করার পাশাপাশি সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নেয়। আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কৃষির চেয়ে শিল্পের ওপর সাধারণ মানুষের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল কৃষিতে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি যে, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। যারা তাদের ভবিষ্যৎ হিসেবে বেছে নিয়েছিল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা এবং শিল্প মাধ্যমকে। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়েছিল ভালোভাবে বাঁচার তাগিদে। পুঁজির বিকাশ ও শিল্পের উদ্ভবের ফলে আমাদের সমাজে আরো দুটো শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল—১. সাবলর্টার্ন ও ২. প্রলেটারিয়াট।

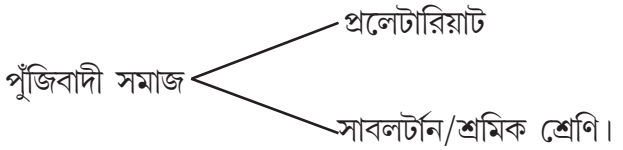

সাবলটার্ন/শ্রমিকশ্রেণি > পুঁজির মালিক।

সাবলর্টার্ন/বুর্জোয়াসি/হেগেমনি শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি। তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত শব্দগুলোকে ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকের ষাট-সত্তর-আশির দশকে আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান দেখাতে গিয়ে গ্রামশির করা সমাজ বিশ্লেষণকেই পাথেয় করতে হয়। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> সমাজবিশ্লেষণে গ্রামশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেগেমনি। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।....গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পায় রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক জাতি, জনগণ বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়া শ্রেণির সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ইত্যাদি প্রশ্ন।
>
> ...কেবল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নয়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও 'সার্বলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামশি। স্পষ্টতই এখানে 'সাবলর্টার্ন'-এর অর্থ শিল্প শ্রমিক শ্রেণী নয়। বরং যে কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠছে এখানে। এই বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'জমিদার শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন নেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণী। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।" [পৃ. ৩][১৭]

আমরা উপন্যাসগুলির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থানটা একটু শুনে রাখা প্রয়োজন।

(ক) স্বাধীনতাপূর্ব ও সমসাময়িক পর্বের রাজনৈতিক দল—

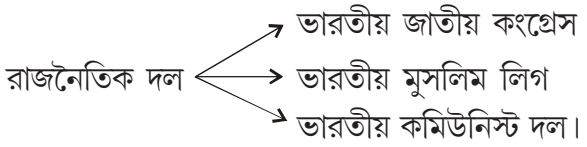

(খ) স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বের রাজনৈতক দল—

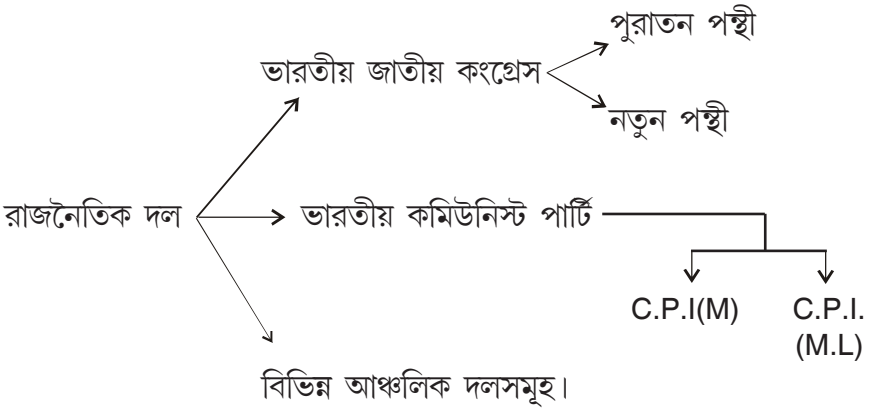

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করব তখন দেখব যে, সেখানে ধর্ম থেকে অর্থই মানুষের মধ্যে মানুষের সম্প্রদায়গত বিভেদ রচনা করেছে। আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সমাজ কাঠামো আলোচনার সময় গ্রামশির করা সমাজ পরিবর্তনের কাঠমোকে মাথায় রেখে পশ্চিমবাংলার আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমিতে সামাজিক ও ধর্মীয় দলগুলিকে বিশ্লেষণ করব। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলার আর্থ-সামাজিক

অবস্থার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজে একশ্রেণির মানুষের কাছে আসতে থাকে প্রচুর ক্ষমতা ও অর্থ। সমাজের আরেক শ্রেণির মানুষ ক্রমশ বঞ্চিত হতে থাকে। সমাজের চারপাশে নানা ধরনের স্বার্থান্বেষী মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মানুষকে পরিণত করল এক প্রকার স্বার্থান্বেষী জীবে। 'এই দাহ' উপন্যাসে চারুলতার উক্তিতে যা, 'ভদ্দলোকের আঁতে ঘা লাগলে তারা কিন্তু ছোটলোকেরও অধম হয়ে যায়।' [পৃ. ৬২][৭৮] সে বলে—

বাবু যেদিন টের পেলেন, তাঁর ভোগে তাঁরই মাইনে করা ঠাকুর ভাগ বসাচ্ছে, সেদিন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললেন, ''হারামজাদি কুত্তি, তোর প্রবৃত্তিরও বলিহারি যাই, তুই ভদ্দরলোকের বাড়ি থাকার উপযুক্ত নোস। রাস্তার কুকুর রাস্তায় যা। বেরো বাড়ি থেকে। আমাকে তক্ষুণি, সেই রাত্তিরেই বের করে দিলেন। ভেবেও দেখলেন না, এত রাত্তিরে যাই কোথায়। আরও মজা কী জানেন, গিন্নি-মা বাপের বাড়ি গেলে বাবু আমাকে পালঙ্কে তুলে, তোকে গয়না দেব, বাড়ি করে দেব, মাথায় করে রাখব চারু—বলে রাতের পর রাত কত সোহাগ করতেন, সে-সব সোহাগের কথা সেই সময় দেখলাম বেমালুম উপে গেল। এমনকি, আমার চার-পাঁচ মাসের মাইনে বাকি ছিল, তাও দিলেন না।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬২][৭৯]

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বেঁচে থাকার তাগিদে নারীদেরকেও রাস্তায় নামতে হয়েছিল জীবিকার তাগিদে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের পাতা ফাঁদে ধীরে ধীরে পা দিতে লাগল। নারী জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। কিন্তু নারী জীবন যুদ্ধে হেরে না গিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যে চিত্র আমরা দেখতে পাই 'মনের বাঘ' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটিতে সুশীলা ও মুংরি সমাজের দুই প্রান্তের দুই নারী কিন্তু একটি ঘটনা তাদেরকে একই বিন্দুতে এনে ফেলেছে—

> সুশীলা অনেক জ্ঞানী হয়েছে। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার অধ্যাপক তাকে ধর্ষণ করেছিলেন, সেজন্য সে এখন নিজেকে মোটেই অশুচি ভাবছে না। মুংরি সংসার প্রতিপালনের জন্য তার দেহ বিক্রি করছে, সেজন্য সে নিজেকে অশুচি ভাবছে না। দেশ ভাগ হবার পর পকিস্তানে একদল গুণ্ডা দুর্বৃত্ত কিছু মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, সেইসব ধর্ষিতারা কি নিজেদের অশুচি ভেবেছে? একদল মেয়ে কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সংসার প্রতিপালনের জন্য দেহ বিক্রি করছে। তারা কি নিজেদের অশুচি ভাবছে? সম্ভবত ভাবছে। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই ভাবছে। সুশীলার স্বচ্ছ দৃষ্টি, মুংরির সতেজ জীবনবোধ তাদের নেই। তারা পাপের কামড়ে ভুগছে। অন্যায় জেনে অন্যায় কাজ করছে। নরকের আগুনে পুড়ছে। হয়তো এমনি পুড়ে পুড়ে তারাও একদিন সত্যে পৌঁছবে, তাদের সত্যে তারা পৌঁছবে, শুচি হয়ে উঠবে। নরকের আগুন আমাকেও তো কম পোড়ায়নি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯][৮৯]

অর্থাৎ এ যুগের আমাদের জগৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সাবেকি সংস্কারে আবদ্ধ নেই। তার সঙ্গে কালও যুক্ত হয়েছে। এখন তার চারটে ডাইমেশন, বা চতুর্মাত্রা। এযুগের বিজ্ঞান শুধুমাত্র জড়বিজ্ঞান নয়। চেতন-অচেতনের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে দুই বিপরীত মেরুতে সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সবচেয়ে কঠিন সত্যটি—

> ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করে পাইকারি হারে ভিক্ষুকদের প্রজননক্রিয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি। এরা অধিকাংশই বেঁচে আছে। কিন্তু এ কী ধরনের বাঁচা? আমরা এদের হয়ে নগর পত্তন করে দিচ্ছি। আমাদের নক্‌শামাফিক বানানো ঘরে এদের এনে বসাবার ব্যবস্থা করছি। সে ঘরে ওদের মন বসবে কেন? ভাড়া বাড়িতে বাস করে তোমার মন বসে? অল দিস সিলি ওয়েস্ট্‌স্। বিল্ডিং মাত্রই হোম নয়, ম্যান। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩][৮১]

স্বাধীনতা প্রপ্তির আগে থেকেই ওপার বাংলা থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুরা এপার বাংলায় আসতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে। শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্বাস্তু সমস্যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা উত্তর

পর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সমস্যাই ছিল সবথেকে বড়ো বিষয়। এক্ষেত্রে রঙ্গচারীর বলা উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

> কখনও কখনও আমার কী মনে হয় জানো, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, এমন দেশের সন্ধান আমার যদি জানা থাকত, যে দেশে সভ্যতা নেই, সভ্যতা মানে আমাদের এ যুগের সভ্যতা, যে দেশে জনমানুষ্যের বসতি নেই, শুধু বন আর আরণ্যক বিভীষিকা তা হলে আমি সমস্ত উদ্বাস্তুদের জাহাজে ভরে সেই দেশে নিয়ে যেতাম, তারপর সেই দেশের উপকূলে গিয়ে লাইফ্-বোটে করে ওদের নামিয়ে দিতাম, তারপর জাহাজটা ডুবিয়ে দিতাম। বলতাম, সেই ডুবে যাওয়া জাহাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতাম, ঐ দ্যাখো, তোমাদের অতীত ডুবে গেল। ঐ দ্যাখো সামনে তোমাদের ভবিষ্যৎ। যদি মরো, মিটে গেল, যদি বাঁচো, সব তোমাদের। [মনের বাঘ পৃ. ৯৩][৮২]

আমরা যদি আবহমান কালের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে, রাষ্ট্র পরিবর্তনকালে ধর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি নতুন কিছু বিষয় নয়। এর ফলে সমাজে বহু বাস্টার্ডের জন্ম হয়েছে। তবুও পৃথিবী ভেঙে পড়েনি। সভ্যতা পিছিয়ে পড়েনি। আমাদের সভ্যতায় আমরা প্রায় সকলেই জারজ। এবং আমরা সকলেই প্রায় জারজদের উত্তরাধিকার। অর্থাৎ এই সভ্যতায় নির্ভেজাল রক্ত কারো নেই। ফলে কাম, যৌনতা ও অন্যপুরুষকে দেহ দানের মধ্যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা বা গেল গেল রবের কিছুই নেই। তাই উপন্যাসটিতে দুলু যখন এক উদ্বাস্তু কলোনি থেকে একজন বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, তখন তার উদ্দেশ্যে গুরুতর অভিযোগ ওঠে—

> দুলু দূরের এক উদ্বাস্তু কলোনি থেকে একজনের বউ চুরি করে এনেছে। এ বিষয়ে দুলুর বক্তব্য ঃ ''চুরি করি নাই, হুজুর। ও নিজের থিকা আইছে। জিগান না? কী রে মাগি, রা কাড়স্ না ক্যান?'' সরস্বতীও সাক্ষী দিয়েছিল, সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে। বয়েস বেশি না মেয়েটার। সবে কুড়িতে পা দিয়েছে হয়তো। খুব আঁটসাঁট চেহারা, ভোঁতা ভোঁতা মুখ, পুরু পুরু ঠোঁট। যৌবনের কাঁচা রং উপচে পড়ছে।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৬][৮৩]

তাই উপন্যাসটির একটি জায়গায় লেখককে বলতে শোনা যায়—

> ভয় ভয় ভয়। সন্দেহ নেই, কলকাতার পুরনো ভিতে ভয়ের উইপোকা লেগেছে। আমাদেরই জীবনের মর্মস্থলে উই ধরেছে। ভয় ভয় ভয়। ভয় আমাদের গ্রাস করেছে। লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মৃতদেহ ভিড় করে আছে কলকাতা নামক কবরখানায়। সেই লাশগুলো, নড়েচড়ে, কথা বলে। আহার নিদ্রা মৈথুনে কাল কাটায়। সিক্সটি মেন অ্যাট ডেড্ম্যানস্ চেস্ট্, ষাটজন নয়, ষাট লক্ষ, ষাট লক্ষ নয়, প্রায় দু কোটি লোক পশ্চিমবঙ্গ নামক মৃতমানুষের সিন্দুকে বাস করে। ভয়ে ভয়ে থাকে। আর আতঙ্কে চেঁচায়। গেল গেল, সব গেল। আর ঘুমায়। ওদের দেহ ঘুমায়, ওদের মন ঘুমায়, ওদের মস্তিষ্ক ঘুমায়, ওদের পাকস্থলী ঘুমায়। বুদ্ধি বিচারবিবেচনা ঘুমায়। ঘুমায় আর আতঙ্কে চেঁচায়। গেল, গেল, সব গেল। ওরা মৃত, তাই নিজেরা কিছু করে না, করতে চায় না, ঝুঁকি নেয় না। খালি চেঁচায়, আমরা বঞ্চিত, আমরা বঞ্চিত। ওরা মৃত, ওদের তাই বাঁচার তাগিদ নেই। ওরা মৃত, মরার ঝুঁকিও ওরা নিতে চায় না।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৪][৮৪]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেমে গেলেও বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রে যুদ্ধ তখনও থামেনি। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে শুরু হয় চাপান উতোর। আর তার মধ্যে অদৃশ্য তৃতীয় শক্তি হল ভারতবর্ষ। যা উপন্যাসে হামজার কথায় স্পষ্ট—

> তোমার এই তৃতীয় শিবির একটি পক্ষিরাজ ঘোড়া। কল্পনায় আছে, বাস্তবে নেই। আর আছে নেহরুর বাগাড়ম্বরে। নেহরু হচ্ছে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি আর আভিজাত্যের বিবেক দিয়ে তৈরি এক বিচিত্র কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। ভিক্ষে নেবার বিবেক-দংশন থেকে মুক্তি পাবার ফর্মুলা এই তৃতীয় শিবিরের ধুয়ো। রশিয়া বা আমেরিকা বা ঐ আন্তর্জাতিক সার্কাসটা, যার নাম ইউ এন ও, ওরা কেউই শান্তি দিতে পারে না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬০][৮৫]

হামজা আরো বলেছিল,পৃথিবীতে সবদেশের লড়াইয়ের মূলে নীতি-ফীতি নয়, আসলে থাকে পলিটিক্স্ আর পলিটিক্সের মূলে থাকে পার্সন্যাল ইগো। রাশিয়াতে কমিউনিস্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়েছে। সেই সম্বন্ধে লেখকের উক্তি—

পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ নামক জীবকে অবলুপ্ত করার পর যে বিস্তীর্ণ শ্মশানক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে, তার ওপর হয় কমিউনিস্ট পতাকা উড়বে, নয় ডেমোক্রেসির পতাকা উড়বে। যেমন, কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের মহাশ্মশানে পাণ্ডবদের পতাকা উড়েছিল, যেমন স্বর্ণলঙ্কার বীভৎস শ্মশানে রামের ঝাণ্ডা গাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেসব ধর্মরাজ্যের প্রসাদ পেয়েছিল কারা? শকুনি-গৃধিনী-শৃগালের দল। মানুষ ভস্মাবশেষে মিশে গিয়েছিল। এই যদি নীতির জয় হয় তো হোক, আমার তাতে লোভ নেই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬১][৮৬]

আসলে 'পৃথিবীতে হয় যুদ্ধ, নয় শান্তি—এছাড়া আর কিছুই নেই।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬১][৮৭] শুধু রাশিয়াতেই নয়, পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। রাষ্ট্রনীতি সামাজিক অবস্থানকে ঠিক করতে থাকে। বিভিন্ন কলকারখানায় ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ ও মতবিরোধ হতে দেখা যায়। সেই সংঘর্ষ ধীরে ধীরে চরম আকার ধারণ করে। ইউনিয়ন শ্রমিকদের তখন একটাই কথা—

একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের, কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করতে হবে, ওসব আপনি আজ্ঞে চলবে না। আমরা মজুর। সর্বহারা। প্রোলেটারিয়েট। মধ্যবিত্তের সকল গন্ধ মুছে ফেলতে হবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৮][৮৮]

ইউনিয়নগুলো চাক্কা-বন্ধের প্রস্তুতিতে মেতে ওঠে। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সামান্যতম দাবিও মানতে রাজি নন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হতে থাকে। যার ফল হয়েছিল মারাত্মক। কমিউনিস্টরা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মেতে উঠে। তারা শ্রমিকদেরকে হাতে রাখতে চায়। কিন্তু একসময় কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে নীতিগত ফাটল দেখা যায়। শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয়, জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও নীতিগত ফাটল ধরেছিল। সে চিত্র আমরা পূর্বের রেখাচিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে সমাজের বুকে কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষেরও জন্ম হয়েছিল। উপন্যাসে রসময় বাবুর মধ্য দিয়ে সেই চিত্রই ফুটে ওঠে। রথীন বলে ওঠে—

সময়বাবুর মতলব ভাল নয়। আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে উনি রস চুষতে চাইছেন। ইউনিয়নে ফাটল ধরাতে চাইছেন। ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যানের পদটি ওঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি পেলে উনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি আছেন। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৯][৮৯]

রসময়বাবুর পাশাপাশি রথীনের মতো মানুষেরাও সমাজে বসবাস করত। তাদের জন্যই হয়তো সমাজে মানবিকতা নামক বস্তুটি শেষ হতে হতেও বেঁচে গেছে। সুশীলার কথায় তা স্পষ্ট—

শ্রমিকদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ওর কাছে এত বড় হল। আজ দুনিয়াতে যেখানে বাঁচা মরার লড়াই শুরু হয়েছে, সেই যুদ্ধে যাতে কিছুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে, শ্রমিকদের তা দেখা কী কর্তব্য নয়? উদরের আহ্বান কী এত বড়ো? অবশ্য এখানকার শ্রমিকেরা মানুষের জীবনযাপন করছে না, সেটা ঠিক, যুদ্ধ আমাদের মাথার উপর এসে পড়েনি, সেটাও ঠিক, তবু তবু না, পার্টির নির্দেশ মানতেই হবে। পার্টির কাছে সব তুচ্ছ, প্রেম, বন্ধুত্ব গৌণ। আমার কোন ভুল হয়নি। বরং পার্টির স্বার্থরক্ষায় ভালোবাসা বন্ধুত্ব উৎসর্গ করে শহিদ হতে পারছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭০][৯০]

অর্থাৎ কঠিন সমাজব্যবস্থার মধ্যে লড়াই করে যারা বাঁচতে চায়, এ লড়াই শুধু তাদেরই। তাদের জন্য সমাজের উচ্চবৃত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণির কোনোরকম মাথাব্যথা হয় না। এ লড়াই শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণির বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণির বাঁচার লড়াই।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ধীরে সমাজ ব্যবস্থা যেমন পালটে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে মানুষের রুচি-রোজগারের ধরনও পালটাতে থাকে। সামান্য জীবিকার টানে মেয়েরা যেমন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিজের দেহকে বিক্রি করতেও দ্বিধা করেনি। ঠিক একইরকমভাবে দেখা যায় ছেলেরা যুক্ত হয়ে পড়ে সামান্য প্রাইভেট মাস্টারের জীবিকাতে কারণ চারিদিকে ভিড় করতে থাকে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা। আমরা লেখকের 'লোকটা' গল্পে সেই সময়ের সমাজের শিক্ষিত যুবকদের করুণ অবস্থাকে দেখতে পাই—

ঘটনাচক্রে সে একটা ভাল টিউশনি পেয়েছিল এবং তার আর্থিক অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে এই ছেলে পড়াবার কাজটা পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল। [পৃ. ১৮৯][৯০]

পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই, সমাজের গভীর অন্ধকারের চিত্র। যা বর্তমান সময়েও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। যার যাত্রাপথ হয়তো শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার কিছু পরে পরে। লেখক উপন্যাসটিকে দেখাচ্ছেন—

মেয়েদের অনেক সময় ভুলিয়ে এনে বদ মতলবে আটক করে রাখা হয় কিনা, তাই। দিল্লির ওদিকে তো প্রায়ই হয়। রোজই কাগজে পড়ি। একবার একটা মেয়েকে ভুলিয়ে এনে তার উপর অত্যাচার করে খুন করে ঘরে বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল, জানো।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৫][৯১]

এইভাবে মেয়েদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গ্রাম থেকে শহরে এনে বা বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে মেয়েদেরকে এনে বিক্রি করে দেওয়া হত। আবার অনেক সময় বিক্রি না করে দিলেও মেয়েদেরকে আটকে রেখে মুক্তিপণ চাওয়া হত। মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত তার নিস্তার ছিল না। এই ধরনের মেয়ে পাচারচক্রের ব্যবসা বা বেকার যুবকদের অর্থের তাড়নায় কিড্‌ন্যাপ চক্রের মতো ব্যবসা রমরমিয়ে চলতে লাগল। আর সেই সঙ্গে সমাজে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল বেকার যুবকদের গুণ্ডাগিরির দৌরাত্ম্য। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নেতাদের মতাদর্শগত বিরোধ এবং ক্ষমতা দখলের লোভ। সেই চিত্রও লেখক দেখিয়েছেন উপন্যাসটিতে। আমাদের সমাজ ধীরে ধীরে গড্ডালিকা প্রবাহের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই চিত্রও এঁকেছেন লেখক উপন্যাসটিতে।

১. গল্পের কথক লোকটা ''পথে নামতেই সে টের পেল, বেশ সন্ধ্যা হয়েছে। খুব ক্লান্ত তবু মেসে ফিরল না। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। সাজগোজ করা মেয়ে দেখল। বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়-চ্যাপ্টা আঁচল-ঘসা মেয়ে দেখল। ভিড়-পাতলা মনুমেন্টের চাতালে গিয়ে বসল। কয়েক ভাঁড় চা খেল। একটা নোংরা মেয়ে, বছর দশ এগারো বয়েস, আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশে অনেক তারা জ্বলজ্বল করছে। মানুষ কী কখনও তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। মেয়েটা ঘাসের উপর বসে পড়ল। হিস হিস করে ট্রাম গেল। একটা মোটা-সোটা মানুষ আতরের গন্ধ ছড়িয়ে চাতালটার এক পাশে এসে বসল। একটা ছেলে আর মেয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল। রাস্তায় গোলমাল, মোটরের হর্ন শোনা গেল। তেল-মালিশ এসে তার পাশে বসল। ফিসফিস করে বলল, ''ভাল আছেন বাবু'। সে বুঝল। ভয় পেল। ভাব দেখাল, খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঢাক ঢোল পিটলেও তার কানে কথা ঢুকবে না। ভাল আছেন বাবু, তাজা মাল।" তেল মালিশ আবার ফিসফিস করল। তার ভয়টা বেড়ে গেল। তেল মালিশ উঠে গিয়ে মোটা বাবুর কাছে বসল। সে দেখল, দুজনে ঘাড় নেড়ে কথা হচ্ছে। তেল-মালিশ উঠে পড়ল। মোটা বাবু আবার তাকে ডাকল। আবার দুজনে খানিকক্ষণ ঘাড় মাথা নেড়ে কথা হল। তেল-মালিশ উঠে মেয়েটার কাছে গেল। দুজনে ফিসফিস কথা হল। মেয়েটার হাসির আওয়াজ শোনা গেল। দুজনে উঠে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করল। মোটাবাবু আতরের গন্ধ ছড়িয়ে উঠল। দুটো ছায়া আগে গেল, একটা ছায়া পিছনে। ক্রমে সামনের দুটো ছায়া পিছনের ছায়াটায় ঢাকা পড়ে গেল। একবার ভাবল, সে-ও যাবে। ওরা কোথায় গেল, দেখবে। হঠাৎ সে টের পেল তার তলপেটের নীচটা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। শিরশির করে একটা শীতল স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে মগজের দিকে ঠেলে উঠছে। ভয় পেয়ে বসে থাকল। একটু পরেই তেল-মালিশ ফিরে এল। সে লক্ষ করল, তেল-মালিশ তাকে আর আদৌ আমল দিচ্ছে না এখন ঘুরে ঘুরে চাপা স্বরে হাঁকতে লাগল, ''তে-ল-স্লাই-স।" [পৃ. ২০৪][৯৩]

উপন্যাসে লোকটা ভাবতে লাগল পৃথিবী রসাতলে যেতে লেগেছে। সে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত প্রচণ্ড অস্বস্তিতে মেসের বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কিন্তু ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে ময়দানের সেই নোংরা মেয়েটাই অনেক বাড়ন্ত হয়ে আর অনেক আতরের গন্ধ মেখে তার বিছানায় উঠে এসেছিল। আর তাই তাকে চাঁদের কলঙ্ক মুছতে সাত সকালে সাবান হাতে কলতলায় ছুটতে হয়েছিল। অন্যদিকে দেখা যায় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। এছাড়া কোম্পানিগুলোর কর্তৃপক্ষ বা মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিক বা কেরানিকুলের দ্বন্দ্ব সবসময়ই হয়ে চলেছে। কোম্পানিগুলো নোটিস জারি করে যে—

''বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কোম্পানিকে বাঁচাতে হলে মরিয়া হয়ে ব্যয়সংকোচ এবং সেই সঙ্গে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। তাই কোম্পানি এবং তার কর্মীদের স্বার্থে ব্যয় সংকোচের প্রথম সোপান হিসাবে ওভারটাইম বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কর্মীরা যাতে হাতের জমানো কাজ শেষ করে যেতে পারেন সেইজন্য কাজের সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল। কোম্পানি আশা করছে যে, কর্মীরা এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।[৯৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ধর্ম সম্প্রদায়ের সন্ত্রাস উগ্রভাবে দেখা না গেলেও শ্রেণি-চেতনা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। শ্রেণি চেতনার স্পষ্ট চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলেন লেখক 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে', 'দুজনে' উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটিতে দেখা যায় যজ্ঞেশ্বর ছিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেকরেটারি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রেণি সচেতন। সে কাউকে খাতির করে কথা বলে না। সে বলত—

আপনার এককাট্টা হয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়ান, দালালি করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না, দেখুন, এই সংগ্রামে জয় আমাদের হবেই। কোম্পানিকে আমি ভয় করিনে, ভয় করি দালালদের, তাদের ঘৃণা করি। মিডল ক্লাস, মানে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিশ্বাস করিনে আমি। ওরা পেটি বুরজোয়া। শ্রেণিগতভাবেই সুবিধাবাদী।

এই পেটি বুরজোয়া শ্রেণিকে নিয়ে সংগ্রাম করা এবং সেই সংগ্রামে জয়লাভ করা খুবই শক্ত। [পৃ. ২৪৬][৯৫]

তৎকালীন সময়ে সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন প্রাক্তন সংগ্রামী মন্ত্রী জানান—

কলকাতার আইন শৃঙ্খলা ধ্বংসের পিছনে কেন্দ্রের সুস্পষ্ট হাত আছে। প্রশাসক জানালেন, এই খুনোখুনি রক্তারক্তি, এটা নতুন কিছু নয়, এটা বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে। অহিংসা জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম থেকেই প্রধানত জাত। এবং বাংলাদেশে তার বিশেষ শিকড় গজায়নি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২][৯৬]

এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের বড়োকর্তা বললেন—

ডিমোক্রেটিক সিসটেমে যদি সেমি ইনসারজেন্ট অবস্থা দেখা দেয় তা হলে ল অ্যান্ড অরডারের অরডারটা বদলে আগে অরডার এবং পরে ল-কে নিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা ও আইন। [তদেব পৃ. ২৮২][৯৭]

তৎকালীন সময়ে কমরেডদের মর‍্যাল স্ট্রেংথ বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল। ফলে তারা সমাজে নানা ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজ করে বেড়াচ্ছিল। যেমন—পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা পার্টি অফিসগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো দুঃখের কথা হচ্ছে, পুলিশ কোনো দমনমূলক কার্যে অংশ নিচ্ছে না বা পুলিশেরা রাজনৈতিক দলগুলির সাথে কোনোরকম সহযোগিতা করছে না। তাছাড়া দক্ষতার মান সর্বত্র নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। সমাজে গোটা অবস্থাটা উল্টেপাল্টে যেতে লাগল। দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে মানুষ খুন হতে লাগল। ক্রমশ মানুষের মানবিকতা বোধ অবলুপ্তির পথ ধরে। উপন্যাসটিতে শচীকে বলতে শোনা যায়—

আমি কি এইভাবে ক্রমাগত সামাজিক অঙ্গীকার অস্বীকার করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা একঘরে করে ফেলছিনে? সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারও পক্ষে আত্মরক্ষা করা কি সম্ভব? আমি এর উত্তর খুঁজছি। সশস্ত্র আততায়ীর আক্রমণ থেকে ছেলেটিকে আমি সেদিন কেন বাঁচাতে যাইনি, তার একটা স্পষ্ট উত্তর আমার জানা আছে। আমি নিরস্ত্র, আমি নিরীহ আমি কোনও অস্ত্রই চালাতে জানিনে এবং আমি আমার প্রাণটাকে মূল্যবান মনে করি, অথবা করিনে, কিন্তু শরীরে চুরির আঘাত বা ডাণ্ডার আঘাত যে যন্ত্রণার জন্ম দেয়, তার সম্পর্কেই আমার একটা আতঙ্ক আছে, তাই আমরা সাধ্যমত সেই যন্ত্রণা বা যন্ত্রণার কারণকে পাশ কাটিয়ে চলতে চাই। এই কারণেই আমি সেদিন তেতালা থেকে ছুটে নেমে যাইনি ছেলেটাকে বাঁচাতে। সত্যি বলতে কি এ পর্যন্ত আমি আমার কাজ সমর্থন করি, এ পর্যন্ত আমার কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু তারপর? আততায়ীরা চলে যাবারপর? ছুটে যাইনি কেন? ছেলেটি যখন রাস্তায় পড়ে অসহায়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় রক্ত অতি মূল্যবান মুহূর্তগুলির

সঙ্গে তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন যাইনি কেন? আমার এই সময়কার কাজ আমার কাছে কেমন অস্পষ্ট, তেমনি অস্পষ্ট আমার তীব্র গ্লানিবোধের কারণ। অথচ কষ্ট পাচ্ছি, দারুণ দংশনেই জর্জরিত হচ্ছি, এটাও তো সত্যি। কেন?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯][৯৮]

এই রকম পরিস্থিতি দেখে লেখক বলেছেন—

''আজকের কলকাতায় এগারো বছরের ছেলে অম্লান বদনে ছুরি চালায়, চোখের পাতা একবারও কাঁপে না, পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরী ফাঁদ পেতে শিকার করে, শ্রেণী শত্রুর গলার নলি দু'ফাক করে দেবার জন্য সোৎসাহে ছুরি এগিয়ে দেয়। এখানে চোহারা দেখে কে খুনে নয় তা বোঝা যাবে, এতই সোজা! আজকের কলকাতায় আমার কাছে সবাই খুনে। হয় সে নিজেই খুন করছে আর না-হয় কোনও না কোনওভাবে খুনেদের মদত দিচ্ছে।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১৮][৯৯]

অর্থাৎ এই সমস্ত নানা কারণে সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। এবং সবাই নিজের সম্পর্কে সদা সচেতন, সতর্ক।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সমাজে নানাধরনের পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছিল নারীর মানসিকতায়। মেয়েরা শুধু রুজি-রোজগারের জন্য বাইরে বেরিয়েছিল তাই নয়, অন্ধ সংস্কারের আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল নতুন এক জগতে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই দেখা যায় ডিভোর্সের রমরমা এমনকি বৈবাহিক সূত্রের বাইরে নানা ধরনের অবৈধ সম্পর্কের বাড়বাড়ন্ত রূপ। আমাদের আলোচ্য 'এক ধরনের বিপন্নতা' ও 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসটিতে সমাজের বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে সেই সমস্ত অবৈধ সম্পর্কে দেখতে পাব। উপন্যাস দুটিতে হিন্দু-মুসলিম বা ধর্ম সংক্রান্ত সমস্যাকে তেমনভাবে খুঁজে পাই না। এখানে ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা বলা যেতে পারে বিকৃত যৌন লালসা কীভাবে ধীরে ধীরে সমাজের বুকে থাবা বিস্তার করছে তারই চিত্র। সেই সমস্ত বিষয়ের দু-একটা নমুনা আমরা দেখতে পাই উপন্যাসটিতে।

১. করবীর স্বামী অনিল। তাদেরই মেয়ে রুবি। অনিল হঠাৎ করে মারা যাবার পর করবী তার মেয়েকে নিয়ে থাকে বন্ধু শীতলের কাছে। রুবিও জানে শীতলই তার বাবা। সে করবীকে বলে—''যে মেয়ে বাবাকে ভালবাসে মা, সেই মেয়ে আদর করে তার বাবার সঙ্গে তুই তো কারি করলে দোষ কী?" [পৃ. ৩১১] আবার অন্যদিকে অনিলের ছবির দিকে শীতল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলে ওঠে—'আমার পলিসির নমিনি এখন রুবি, অনিলবাবু। আমাদের সম্পর্ক? শীতল নিঃশব্দে বলল, আমি লিখেছি ডটার।' [পৃ. ৩৩৯][১০০]

২. কখনো কখনো শীতলের মনে হয়েছে করবী বা রুবির বিকল্প তাজা আশ্রয় তার চাই। আর তাই হয়তো শমিতার মধ্যে সেই আশ্রয়কে খুঁজে পেয়েছিল। তাই শমির প্রশংসা তার ভাল লাগে। ''কোনও মেয়ে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এইভাবে খোলাখুলি কথা বলেনি। না, করবী তো নয়ই। তাছাড়া যে অভিজ্ঞতার থেকে এই ধরনের পরিণতি আসে, সেই অভিজ্ঞতা করবীর নেই। তাজ্জবের কথা, শীতল শমির প্রতি আকৃষ্ট বোধ করছে। নিতান্ত এক শারীরিক আকর্ষণ। শীতল সতর্ক থাকবার চেষ্টা করতে লাগল।...

শীতলের পঁয়তাল্লিশ বছরের উপোসী শরীরে ক্ষুধার প্রবল জোয়ার এসে গেল।

'উই আর মেড ফর ইচ আদার।" [সমগ্রন্থ পৃ. ৩৪২][১০১]

৩. সময় যত এগিয়েছে ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েদের ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনের চিহ্নই আঁকা হয়েছে শমির ভাবনার মধ্য দিয়ে। ''শীতল যেভাবে কথা বলছে তাতে তাকে বিশ্বাস না করে পারছে না শমি। কিন্তু পুরুষের কথা বিশ্বাস করার পরিণাম কী মারাত্মক হতে পারে, জিতু তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। শীতলকে যদি জিতু পিনটুর শ্রেণীতে ফেলতে পারত শমি তা হলে সে স্বস্তি পেত। শীতল ধূর্ত, গভীর জলের মাছ, হয়ত আরও বেশি শয়তান, শমি তার আত্মরক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

অন্যদিকে শীতলের চোখে অপ্রতিরোধ্য সেই আকর্ষণ জেগে উঠল। সেই আকর্ষণের চুম্বকের টানে রুবির শরীরের সমস্ত অণু পরমাণু ছটকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইল।

অর্থাৎ শমিতা যাকে সে মানুষের জগৎ ভেবেছিল, ''এখন প্রতি পদে বুঝতে পারছে শমি সেটা একটা নিষ্ঠুর অনুভূতিহীন বলদর্পী পুরুষের জগৎ। অথবা এটা মানুষের জগৎ। পুরুষেরা নিছক দৈহিক বলের দ্বারা এই মানুষের জগৎটাকে সাম্রাজ্যবাদীর মতো দখল করে রেখে দিয়েছে। এখানে যা কিছু মানবিক, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ভাবনা ধারণা, মায়া ভাষা শব্দ ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত পুরুষের নির্ব্যুঢ় স্বত্ব চিরস্থায়ী করার দিকে চোখ রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা পুরুষের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে সব বিকৃত করা হয়েছে।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭১][১০২]

'এক ধরনের বিপন্নতা' উপন্যাসটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শরীর-সর্বস্বতার বাইরে এসে ভিন্ন বোধবুদ্ধির মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন লেখক। উপন্যাসটিকে যে বিন্দুতে তিনি শেষ করেছেন, সেখান থেকেই তিনি পরবর্তী উপন্যাস 'কমলা কেমন আছে' তার কাহিনিটি ধরতে চেয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসটিতে পুরুষের যৌন ক্ষিদে, নারীর ধর্ষণ হওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের দৌরাত্ম্য এবং সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের ভূমিকা এই সমস্ত বিষয়গুলিকে একটি চালচিত্রে আনতে চেয়েছেন লেখক। সেক্ষেত্রে হয়তো তিনি দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলেই আমাদের মনে হয়। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র 'কমলা'। অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপন্যাসটির কাহিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জীবিকার তাড়নায় ঘর থেকে বাইরে বেরোতে হয়েছিল। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে মেয়েদেরকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা কুৎসিৎ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার কিছু নমুনা আমরা দেখতে পাব উপন্যাসটিতে। ছটা পনেরোর গ্যালপিং ট্রেন। কমলার একপাশে এক বুড়ো, যে খক খক করে কেশেই চলেছে, তার আরেকপাশে অন্য আরেকটি লোক কাগজ পড়তে পড়তে তার বুকের উপর আলগোছে তার কনুইটা রেখেছে।

> পাশের লোকটা তার গায়ের সঙ্গে একবারে সেঁটে বসে আছে। কখনও তার জাং কমলার জাংকে চেপে ধরেছে। কখনও বা তার হাঁটু কমলার হাঁটুটাতে এসে ঠেকছে। লোকটার কনুই কমলার বুকের উপর দিয়ে আলতোভাবে পিছলে নেমে গেল। তার স্তনের মুখে চাপ পড়তেই কমলার শরীরটা শির শির করে উঠল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১৯][১০৩]

ধীরে ধীরে লোকটি কমলার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লোকটি তার চেষ্টায় সফল হল। লোকটি যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল কমলার উপর। চলন্ত ট্রেনে কমলা একজন অচেনা লোকের যৌন নিগ্রহের শিকার। যা বর্তমান সময়ে রোজই কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার কিছু পরে পরেই। লোকটি কমলাকে বলে 'কোনও রকম বোকামি করে লাভ হবে না।' চুপ করে শুয়ে থাকুন।' এখন কমলা শুয়ে আছে। নিথর। আলুথালু। লোকটাকে ঠেকাতে পারেনি সে। প্রথম দিকে তার শরীরটা ভয়ে শেঁটিয়ে ছিল, এমনিভাবেই সে কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল। যতক্ষণ পেরেছে কমলা, প্রতিরোধ করে গিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উপোসী শরীরটা যখন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, লোকটার জবরদস্তিতে ধীরে ধীরে সাড়া দিতে লাগল, তখন, এমন সে কখনও হতে পারে, এটা দেখে কমলা বিমূঢ় হয়ে গেল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৯][১০৪]

সমাজে এই ধরনের ছোটো ছোটো ঘটনা ধীরে ধীরে বড়ো আকার ধারণ করতে থাকে। এর সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা। আলোচ্য উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই নকশাল আন্দোলনের উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসটিতে কমলার স্বামী বিকাশ ও তার ধর্ষণকারী ব্যক্তি সুকুমার দুজনেই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার টাকা। সুকুমারের মতো মানুষেরা ভেবেছিল তারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাকে একদিন জয় করবে। 'আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন, এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস আমরা জয় করব একদিন।' [পৃ. ৪৮২][১০৫] তাদের সেই বিশ্বাস অচিরেই ভেঙে যায় তৎকালীন বাংলার সরকারের বদান্যতায়। এর পাশাপাশি সমাজে তখনও রয়েছে জাত-পাতের সমস্যা।

সেই ছবিও দেখতে পাই উপন্যাসটিতে। কমলার সাথে বিকাশের বিয়েটা হয়েছিল তার মতের বিরুদ্ধে। তার পছন্দের পাত্রটির সঙ্গে তাদের জাতের কোনো মিল ছিল না। তাই কমলার বাবা নকশাল নেতা বিকাশকেই নির্বাচন করেন কমলার যোগ্য পাত্র হিসেবে।

> বিকাশ। তার স্বামী। বাবার জেদ। তাই অনিন্দ্যকে যেতে হল। অনিন্দ্য তার বাবার মতে, ছেলে ভালো। কিন্তু অনিন্দ্যের সঙ্গে তাদের জাতে মেলে না। তাই অনিন্দ্যকে সরে যেতে হল। আর কোনওদিন দেখা হয়নি অনিন্দ্যর সঙ্গে। বিকাশের সঙ্গে তাদের জাতে মিলেছিল। তাই বাবার জেদে বিকাশ তার স্বামী। কোথায় বাবা? কোথায় মা? এখন বিকাশ এসেছে। পড়ে আছে অন্ধকার রোয়াকের ওই কোণে। নিজে নিজে উঠতে পারে না, হাঁটতে পারে না। পক্ষাঘাত। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২০-৪২১][১০৬]

আমরা এতক্ষণ ধরে গৌরকিশোর ঘোষের বিভিন্ন উপন্যাসগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। উপন্যাসগুলিতে যে সময়কাল লেখক তুলে ধরেছেন তা হল স্বাধীনতা-পূর্ব, স্বাধীনতা-সমসাময়িক ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব কালকে। এই সময়গুলোতে ধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজ কেমন ছিল এবং ধীরে ধীরে সমাজের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বা সমাজ কোন্‌দিকে ধাবিত হচ্ছে তা তিনি উপন্যাসের কাহিনির মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আর সেই সমস্ত জায়গাকে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করাই আমাদের কাজ। এবার আমরা তাঁর গল্পগুলির মধ্য দিয়েও সমাজের সেই একই অবস্থানকে দেখার চেষ্টা করব। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিমবাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন হানাহানির থেকেও বড়ো হয়ে দাড়িয়ে ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার বুকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছিল। সমাজের শোষিত শ্রেণির বা নিম্নবর্গের প্রায় সব শ্রেণির মানুষেরই দাবি ছিল আর্থিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করে। মানুষে মানুষে বিরোধ তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যকে ঘিরে। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য মুছে না গেলেও তা নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধ বহুলাংশেই কমে গিয়েছিল। সমাজে তখন শুধুমাত্র পুঁজিবাদী শ্রেণির বাড় বাড়ন্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

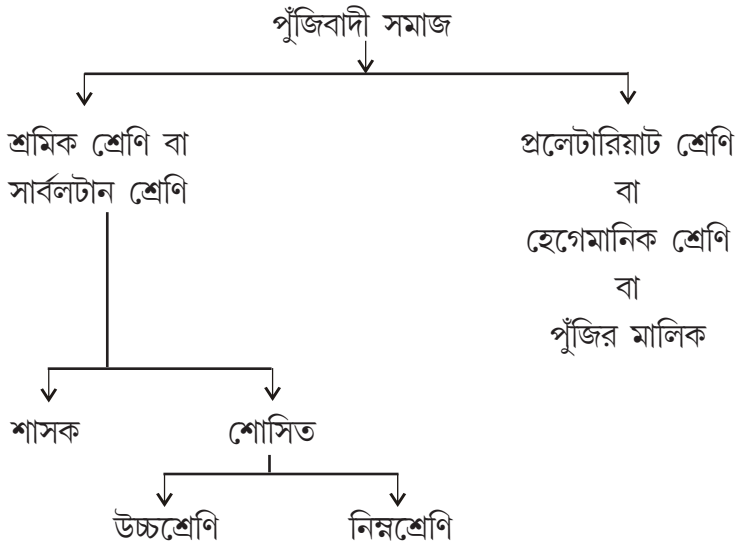

আমাদের আলোচ্য লেখক গৌরকিশোর ঘোষের গল্প রচনার সূচনাকাল বিশ শতকের চারের দশক। যেখানে যুদ্ধ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশবিভাগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘটনা থেকেই উঠে এসেছে লেখকের গল্পের বিষয়, গল্পের বিভিন্ন চরিত্র এবং গল্পকারের জীবনজিজ্ঞাসা। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেখকের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভিক পর্বটি কেটেছে নবদ্বীপে। লেখকের জীবনের প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিজেই তুলে ধরেছেন ‘এই কলকাতা’ নামে গল্পগ্রন্থটিতে। তিনি লিখছেন—

‘এই কলকাতায় আবার পা দিলুম।

ন'টা সাতান্ন লোকাল থেকে বোরা-ছেঁড়া আলুর মতোই একদিন সবার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লুম গোটা প্লাটফর্মে।

মফস্বল থেকে কলকাতা এসেছিলুম লেখাপড়া করতে। জ্ঞান দরিয়ায় পানসি ভাসিয়ে মনের সুখে বেশ কিছুদিন বৈঠা বাইব এই আশা।

গড়পারে থাকতেন এক আত্মীয়। মস্ত মানুষ আমার সেই গুরুজন ব্যক্তিটি—যাঁর আশ্রয়ে থেকে দুনিয়ার চৌকাঠ পেরুবার পাঠ নিয়ে আসা। বিদেশ ফেরতা ডাকাবুকো লোক, যাকে বলে কাবিল আদমি। সম্পর্কে খুড়ো।

...কিন্তু বাপ পিতাম' চোরের ভয়ে পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, বোধকরি সেইজন্যেই টাকা কড়ির দিকটা সংক্ষেপে গড়ের ময়দান করে রেখে গেছেন। আর নিজের হেকমতের চাক্কা গাড্ডায় পড়লে ভাগ্যমন্ত আত্ম-স্বজনের গাড়ির পেছনে চেপে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করাই তো রেওয়াজ রীতি। অতএব ভবিতব্য ভেবে, ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা ঠুকে অনেক খুঁজে বের করা বাড়ির কড়া নাড়লুম, দরজা খুলল।

...আমার বাঁ বগলে ময়লা শতরঞ্জি জড়ানো বিছানা আর ডানহাতে ঝোলানো চটাওঠা টিনের সুটকেস। কাঠ বাঙালের মতো আমার 'র' চেহারা খুড়োর গ্যালিশ আঁটা ধোপদুরস্ত ইজের ঢোকানো বপুটার পাশে যা মানাল, মনশ্চক্ষে চেখে নিয়ে জুতসই উপমা দেবার বয়েস সেটা ছিল না তাই রক্ষে। [পৃ. ৩][১০৭]

তিনি আরও বললেন—

''এবারে যখন কলকাতায় পদার্পণ করলাম সর্ববিষয়ে লায়েক হতে আর অল্পই বাকি। চোস্ত জবানরপ্ত হয়েছে আর ছত্রিশ দরজায় ঠোক্কর খেয়ে খেটে গতর মন পোক্ত ঝানু হয়ে গেছে।

সময়টা আবার এমন, শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে ঘূর্ণির চক্করে বিনি পয়সায় ঘোল খেয়ে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর কথাই বলছি। তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন আর মানুষ নেই। কোনও এক রূপকথার দৈতের ফুসমন্তরে দুটো লড়ুয়ে মুরগি বনে ও একে ঠোকরাতে শুরু করেছে। দূর বিদেশের লোক, কোনওদিন চর্মচাক্ষুষ না করলেও আমাদের চেনা দরিয়ার কূলে কূলে বা'চ খেলে বেড়াচ্ছে। চেম্বারলেন চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, তোজো অপরিচয়ের চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আর গলা খাঁকারি দেয় না। সকল আগল ঠেলে পরিচয়ের অন্দরমহলে হুট করে প্রবেশ করে মাসি পিসির দেওর ভাশুরের মতোই।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২০][১০৮]

সদ্য গ্রাম থেকে আসা এক সদ্য যুবকের শহর এবং গ্রামের পার্থক্যটা খুবই জীবন্তভাবে ধরা পড়েছিল। সেই সঙ্গে ধরা পড়েছিল মানুষের মন নামক বস্তুটি অর্থাৎ মানুষের মনে সুখ-দুঃখ নামক সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো 'সদা বয়ে যাওয়া প্রাণের বন্যায় তা কখন কোথায় যেন ভেসে গেছে' তা মানুষ বুঝতেও পারেনি। আর সেই সঙ্গে ধর্মকে কেন্দ্র করে চারিদিকে খালি ত্রাহি ত্রাহি রব এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে রাজনীতির অঙ্গন পর্যন্ত ধর্মের ধাপা জোড়ানো হয়ে বসেছে। যার পরিণতি ধর্মকে কেন্দ্র করে অখণ্ড ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডিত হওয়া। যার একদিকে হিন্দুস্থান আর অন্যদিকে পাকিস্তান। তখন সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় নানান টানাপোড়েন। কারণ রাজনৈতিক চাপান-উতোর সমাজকে ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর সমাজের সেই রকম এক অস্থিরতার ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক—

> তখন সিঙ্গাপুরে বোমা পড়ছে। রেঙ্গুন ছাড়ু ছাতু। বর্মায় জাপানিরা ঢুকে পড়েছে। ওসব অঞ্চলে দারুণ লড়াই হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। লড়াই সম্বন্ধে ব্যারাকে বসে নানারকম আলাপ আলোচনা হয় শুনি। একদিন শুনলুম, এই এ. আর. পি. এ. আর কিছু নয়, লড়াই-এ ভর্তি করবার আড়কাঠি। এখানে যারা ভর্তি হয়েছে কারো আর নিস্তার নেই। সবাইকে যুদ্ধে যেতে হবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩][১০৯]
>
> যুদ্ধের বীভৎসতার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল। না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। দুটো জাহাজ ভর্তি আহতের ভিড়। বৃদ্ধ যুবক শিশু পুরুষ নারী। কেউই রেহাই পায়নি। কারো হাত নেই, কারও পা নেই, মাথাফাটা, চোখ খুবলানো বিকলাঙ্গ মানুষের ভিড় এমনভাবে আর নিবিড় করে দেখিনি। অনভ্যস্ত স্নায়ু ঠিক থাকতে পারল না। পুঁজ রক্তের পচা গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক নার্স। আমার অবস্থা দেখে ইউক্যালিপটাস তেলমাখা একখানা রুমাল এগিয়ে দিলে। হেসে বললে, এলাইনে নতুন বুঝি? লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে

জানালুম, হ্যাঁ, বললে, বুঝেছি, বাইরে যাও, একটু পরেই ধাতস্থ হয়ে যাবে'খন। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৪][১১০]

তখন গ্রাম শহর প্রত্যেকটি ক্যাম্পেরই প্রায় একই চিত্র। চারিদিকে খালি বীভৎসতার চিত্র। নিজেদের স্থায়ী বাসস্থানকে হারিয়ে ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। ক্যাম্পে বসবাসকারী যুবকদের প্রায় জোর করেই নিয়ে বাওয়া হচ্ছিল যুদ্ধের জোগ দেবার জন্য। সেই সময়ের কলকাতা শহরের বীভৎসরূপের নমুনা পাওয়া যায় লেখকের করা আরেকটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে—

> ভাঙা একটা টিনের সুটকেস সম্বল করে একদিন কলকাতার এসেছিলুম। আর এই কলকাতা ছাড়লুম এক ভাঙা মনে তোরঙ্গ ঘাড়ে করে। হাওড়ার নতুন পুলের অর্ধেকটা তখন তৈরি হয়েছে। পুরনো পুলটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। নতুন পুলের অর্ধসমাপ্ত গার্টারগুলো গঙ্গার উপর ঝুলে রয়েছে। আমার মনে হল ওগুলো অভ্যর্থনা-আকুল কলকাতার প্রসারিত দু'টি বাহু! সস্নেহ দু'টি বিশাল বাহু বাড়িয়ে স্মিত হেসে কলকাতা যেন বলছে, আগচ্ছ, ইহ আগচ্ছ। এসে, ফিরে এস। এসেছি, বার বার এসেছি এই কলকাতায়। আনন্দ পেয়েছি, আঘাত খেয়েছি। বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে ফিরে গেছি। তবু কলকাতার ডাক এড়াতে পারিনি। কিন্তু থাক! সে তো নতুন কেচ্ছা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬০][১১১]

১৯৪৭ সালে ধর্মকে কেন্দ্র করে অখণ্ড ভারতবর্ষের ভাগ হলেও সমস্যা জটিলতা এখনও পর্যন্ত কাটেনি। স্বাধীনতার পরপর পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুদের থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেই চিত্র আমরা দেখতে পাই 'শিকার' গল্পে—গল্পটিতে কুসুমের কথার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

> মরি মরবো, শ্বশুরের ভিটেতেই মরবো, যাবো না আর কুথাও। থাকতে কি ওদেরই অসাধ! কিন্তু কেউ যে থাকল না গাঁয়ের। মাতব্বর প্রধান যারা, যারা শক্তিমন্ত তারাই থাকতে সাহস করল না। পালাল হুড়হুড় করে, পাকিস্তানে শুধু নাকি মুসলমানরাই থাকবে। হিন্দুদের নাকি স্থান নেই সেখানে। মাতব্বরদের কাছেও ছুটেছিল তারা। মেদ্ধা সাহেব, গাজি সাহেবরা তো ভরসা দিলেন। ভিটে ছেড়ে যেতে বারণ করলেন। গুজব কথায় কান দিতে নিষেধ করলেন। পাকিস্তান কি, হিন্দুস্থান কি, এই গাঁয়ের মাটি তাদের। সেই ভরসাতেই তো ছিল এতদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সবাই পালাল বাড়ি-ঘর খালি করে। খালি বাড়ি ঘর পেয়ে ঢুকতে লাগল বিদেশি বিজাতিরা। কথা বোঝে না যাদের, ভরসার বোঝে না, নানারকম কথায় আতঙ্ক বাড়ে। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা দেখে ভয় হয়। তবুও না হয় থাকা যেত, যদি থাকত সবাই, যদি পেত কত্তাদের অভয়, প্রতিবেশী শক্তিমানদের দরদ ভালবাসা। কিন্তু গাঁয়ের সবাই যখন পালাল, সব কটা গাঁ যখন প্রায় খালি হয়ে এল, যখন কেউ রইল না, টেপাখোলায়, হরিনারায়ণপুরে, মহদে'য়, মোষবাতানে, গাঙ দিঘড়েয়, তখন ওরাই বা একঘরে কি করে থাকে টিম টিম করে! ওদেরও তো মান সম্ভ্রম আছে। আছে মাগ মেয়ে। তবে? গড়িমসি করতে করতে এতদিন কাটল।
>
> ...ওই যে কনথে যেন আয়েছে সব মিনষেরা, যখন মাগীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানে নিয়ে যাবেনে, বনবাদাড়ে তখন ঠিক হবে নে!" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৩][১১২]

কি যে সমস্ত মানুষ নিজেদের বাস্তুভিটে ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় চলে এসেছিল। তারা ভয় পেয়ে ওপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় আসেনি, এসেছিল পরিবারের অর্থাৎ মা-বউ-মেয়ের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে। যে ভরসায় তারা বাবা-শ্বশুরের বাস্তুভিটে ছেড়েছিল, কিন্তু সেই ভরসা বা নিরাপত্তা এপার বাংলার সমাজ পরিবেশ বা রাজৈনতিক অবস্থান তা দিতে পারেনি। ওপার বাংলা থেকে যারা এসেছিল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তাদের মধ্যে অনেকেই এপার বাংলায় এসে পরিবার-পরিজন অনেককে হারিয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল ওপার বাংলায়। উপন্যাসটিতে কুঁড়োরাম চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে আমরা যা দেখতে পাই।

> এ-যে মস্ত শহর। অজগরের মতো অজস্র রাস্তা। সাপের জিভের মতো অসংখ্য গলি। কোন্ মুখে যাবে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? কুঁড়োরাম অস্বস্তি বোধ করে। দিশে পায় না বাঁশরী। ওরা মোর গুণে, চিহ্ন রেখে

এগুতে থাকে। যত এগিয়ে যায় ওরা ততই শহর বাড়তে থাকে। রাত্তির হয়। লোহার ঘুঁটোর উপর ঠুঙ্গি-পরা বিজলি বাতি ঝিলিক মেরে জ্বলে ওঠে।...মানুষের অরণ্যে পথহারা হবার আশঙ্কা তাদের বিচলিত করে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৮][১১৩]

তারা যখন আশ্রয়ের জন্য হন্যে হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল, তখন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে বাস্তুহারা-ত্রাণ সমিতির এক আধাবয়সী সম্পাদক।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। গঙ্গার জলে সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়। সন্ধ্যা গাঢ় হয়। রাত্রি গভীর হয়। ভোরের সূর্য গঙ্গার জলে আলো ফেলে। কিন্তু দালালটি আর ফিরল না। সমস্ত রাত কটি প্রাণী গাছতলায় বসে কাটায়। ছোটরা গুটিশুটি মেরে ঘুমোয়। রাতের ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেশে ওঠে। বড়দের চোখে ঘুম নেই, জল নেই, আগুন নেই। পাথর হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয় না এতবড় প্রবঞ্চনা। অনেকক্ষণ পরে ক্ষেতরের মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হয়, ''ভগবান''।

আশ্রয় একটা পাওয়া গেল। যোগাড় করে দিলে ওখানকারই একজন লোক। নাম তার সুন্দর গোঁসাই। আধাবয়সী এই লোকটা বাস্তুহারা ত্রাণ-সমিতির সম্পাদক। গায়ে পড়েই আলাপ করল। নিজের উদ্যোগে ঘরখানা ভাড়া করিয়ে দিল। ঘর দেখে ওদের তো চক্ষুস্থির। দেশের বাড়িতে ভাঙাচোরা হলেও চার পোঁতায় চারখানায় ঘর ছিল। এখন এই একখানা ঘুপ্‌সি অন্ধকার কুঠুরিতে সবাই মিলে থাকবে কী করে?

সুন্দর গোঁসাই এক গাল হেসে বলে, ''তাও তো পেলেন মশাই। আপনাদের আশীর্বাদে সবাই একটু মান্যগণ্য করে, সহায় সম্পত্তি কিছু আছে এই নগরে। তাই কোনওরকমে একটুন যোগাড় করতে পেরেছি।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯][১১৪]

কিন্তু তাদের এই আশ্রয়ও তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। অর্থাৎ এপার বাংলার নবদ্বীপ জনপদ, মানুষজন কোনো কিছুই কুঁড়োরামের পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারেনি। কারণ কুঁড়োরামের পরিবারের সদস্য বাতাসী রাস-পূর্ণিমার ভাসান দেখতে গিয়ে সে আর বাড়ি ফিরে আসে না।

''বাতাসী আর ফিরল না। দু'দিন ধরে খোঁজাখুঁজি। তোলপাড় করে তুলল শহর, কিন্তু নেই। বাতাসীর পাত্তা নেই। সুন্দর গোঁসাইয়েরও আর দেখা নেই। ওদের আশেপাশে আতঙ্ক ভয়। নিরুপায় ক্রোধ। আর উপরে নিরাবলম্ব আকাশ। কেউ ভাবে না। কেউ কাঁদে না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৯][১১৫]

বাতাসী নিজের অজান্তে সুন্দর গোঁসাইয়ের লোভ-লালসার শিকার হয়ে যায়। একদিকে বাতাসী সুন্দর গোঁসাইয়ের শিকার হয়ে যায়, অন্যদিকে তার পরিবার কলেরার করাল গ্রাসের শিকার হয়ে যায়। যে নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য তারা সহায় সম্বলহীন হয়ে এপার বাংলায় এসেছিল। কিন্তু তাদের সেই শেষ সম্বল পরিবারের সম্ভ্রমও পথে বিকিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হল ওপার বাংলায়। তারা এসেছিল ওপার বাংলা থেকে 'নোয়জন লোক, আর সাতটা মো-ও-ট। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৮][১১৬] আর এপার বাংলায় এসে পরিবারের সম্মান খুইয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে 'সাতজন লোক আর একঠো মো-ও-ট।" [পৃ. ৯১][১১৭]

'শিকার' গল্পটির কাহিনির রেশ বহন করে চলেছে পরবর্তী' গল্পগুলি, 'একটি প্রতিশোধের কাহিনী', 'আগমনী', 'ম্যানেজার', 'জবানবন্দি', 'অন্ধকূপ' গল্পগুলি। 'ম্যানেজার' গল্পেও শিকার গল্পের মতো আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে খাদ্যসংকট, উদ্বাস্তুসমস্যা এবং এর মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। 'ম্যানেজার' গল্পের শুরুতেই লেখক নিজের স্বগোতক্তি করে বলেছেন—

ভিখারি মেয়েদের নিয়ে কি গল্প লেখা যায় না? যায়। তা ম্যানেজারকে নিয়ে যায় কিনা, তাই হল প্রশ্ন। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২০][১১৮]

গল্পটিতেও আমরা দেখতে পাই—

ম্যানেজারের জীবন চলত মাধুকরী করে।

নবদ্বীপ গোঁসাই বোস্টমের জায়গা। হাতে পাত্র নিয়ে যাবার সময় গৃহস্থ বাড়ির দরজায় 'জয় রাধে' বলে দাঁড়ালেই ভাত তরকারি পাওয়া যেত। একেই বলে মাধুকরী। দু-তিন বাড়ি ঘুরে এলেই পাত্র পূর্ণ হত। আর ম্যানেজারও তার খোপে গিয়ে ঢুকত। দু-তিন দিন আর তার টিকি দেখা যেত না। কিছু খাবার থাকলেও কচ্চিৎ সে বেরোত। হয়ত এসে বলত, ও খোকার ঘরে পেঁজ আছে? দেও না এটটা। হয়ত বলতাম, বিধবা মানুষ, তুই পেঁয়াজ কী করবি? একটু হেসে ম্যানেজার জবাব দিত, পরশু দিন গৌরাঙ্গবাড়ি থেকে খিচুড়িভোগ এনেলাম। আজ খাতি গিয়ে দেখি গন্ধ ছাড়ছেন। পেসাদ নষ্ট করতি তো নেই। তাই ভাবলাম, একটা পেঁজ দেখি যদি খোকার কাছে পাই।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২১][১১৯]

আমরা দেখলাম লেখক গল্পটিতে ম্যানেজারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথায় যে সালটি উল্লেখ করেছেন তা ছিল ১৯৩৬ সাল। সেই বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থাৎ বন্যায় নবদ্বীপের বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে রানির চড়া, বড়ালের খাট, শ্রীবাস-অঙ্গন, ফাঁসিতলা, বনচারীর বাগান ডুবে গেছে। সেই সঙ্গে ভাদুড়ী গর্তে গঙ্গার জল পড়ে ভাসিয়ে দিল রাধাবাজার। রামসীতা পাড়ার মোড় পর্যন্ত ডুবে গেছে। বড় আখড়া গোবিন্দবাড়ি জল থইথই। আগমেশ্বরী পাড়ার রাস্তা ডুবে বাগচি-বাড়ির কাছে জল পৌঁছে গেল। এই রকম জলমগ্ন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন-যাত্রা একরকম জলের স্রোতেই ভেসে গিয়েছিল। গল্পটিতে তাই লেখককে বলতে শোনা যায়—

> কী আকাল যে দেশে এল, কী আকাল! চাল নেই, ধান নেই, ভিক্ষে বন্ধ হল। মাধুকরী মেলে না। ম্যানেজার কী করে চালায় জানিনে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৭][১২০]

পাড়ায়-পাড়ায় ফুড কমিটি গড়ে রেশনের শুকো চাল বিতরণ হতে লাগল। খেতে না পেয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যেতে লাগল। যারা গ্রাম থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে এসেছিল, ছটফট করে মরল খিধের জ্বালায়। তারই বিবরণ আমরা দেখতে পাই গল্পটিতে—

> হরেকেষ্ট বৈরাগী, তার জ্যাঠা গলায় দড়ি দিলেন। বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে গেল। সারা শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে।
>
> ফুড কমিটির তরফ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হল। বেলা বারোটা থেকে সন্ধে ছটা—এই ছয় ঘণ্টা আর বিরাম পাওয়া যেত না, আমরা চালে-ডালে সাত মণ সিদ্ধ করতাম রোজ। ফুস করে উড়ে যেত। থাকত শুধু খাই খাই রব। পেট যে মানুষের কী তখন টের পেয়েছি। পেট সইছে না, প্রায় কলেরার মতো হয়েছে লোকের, লঙ্গরখানা নষ্ট করে দিচ্ছে, তবুও গবগব করে গেলার কামাই নেই। সে আজ কতদিন হয়ে গেল। কিন্তু এখনও সে দুঃস্বপ্ন স্মৃতি থেকে যায়নি।
>
> একজনে দিনে একবার খাবে, এই ছিল লঙ্গরখানার নিয়ম। পরিমাণ ছিল মচ্ছবের হাতার তিন হাত। খিচুরি কিন্তু দুবার তিনবার করে খেয়ে যায়। ওদিকে কেউ কেউ একবারও পায় না। ভাল কথায় অনেক বোঝাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু ক্ষিধে কি বুঝ মানে?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮][১২১]

সেই সময় চারদিকে এত ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় যে, মাটির উপর ফেলে দেওয়া খিচুড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ে চাটতে লাগল। এই সময় দুঃস্থ ভদ্র পরিবারগুলোর সংকট চরমে পৌঁছেছিল। পরনের যথেষ্ট কাপড় না থাকার জন্য দিনের আলোতে তারা বাইরে বেরাতে পারছিল না। তাদের কথা পার্টি থেকে রিলিফ কমিটিতে বলা হয়েছিল। এবং রিলিফ কমিটিগুলোও তাদের সাহায্যের কথা বলা হলেও তা তারা সবসময় সময়মতো করে উঠতে পারেনি। পাশাপাশি ব্ল্যাক মার্কেটের দৌলতে ব্যবসায়ীরা রাজা হয়ে উঠতে লাগল। গল্পটিতে লেখক মাখন সা-র মতো ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করেছেন—

> তিন বছরের মধ্যে মাখন সা-র কত পয়সা হল। ওর লুকানো গুদামে হাজার হাজার মণ চাল। শত শত গাঁট কাপড়।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩০][১২২]

এর ঠিক দশ বছর পরে অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তি বছরখানিক আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও নবদ্বীপ শহরের প্রায় একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। লেখক তাই বলেছেন, দুনিয়া কত বদলে গেল। দশ বছরের মধ্যে কত কি হয়ে গেল দেশ-বিদেশে। কিন্তু নবদ্বীপ শহরের একেবারেই পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ম্যানেজারেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

> ম্যানেজার, একঢাকা বারান্দার অন্ধকার কোণে বসে আছে। ওর পোঁটলা পুঁটলি হাঁড়িকুঁড়ি কিছু খোয়া যায়নি।' অথচ রানিরচড়া, রামচন্দ্রপুরে কত পয়সাওয়ালা লোক, মহাজন, যারা বাসা বেঁধেছিল, এই বন্যায় তাদের অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। ওপারে চর ব্রহ্মনগরে পাকিস্তান থেকে আসা পাঁচ হাজার ঘা খাওয়া তাঁতি পরিবার তাদের ভাঙা সংসার গুছিয়ে তুলেছিল। কী একটা কাপড়ের হাট গড়ে উঠেছিল স্বরূপগঞ্জে। মাসে লাখ আষ্টেক টাকার লেনদেন দিন। বন্যায় এক ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাদের সাজানো সংসার। কিন্তু ম্যানেজারের সেই আদ্যিকালের ফুটে মেটে হাঁড়ি আর ছেঁড়া কাপড়, ম্যানেজারের যা কিছু সম্পত্তি, এককুটিও নষ্ট হয়নি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৩][১২৩]

লেখকের ম্যানেজারকে দেখে মনে হয়েছে ছারপোকার মতো যারা কোটি কোটি বছর টিকে আছে শুধুমাত্র রেকর্ড গড়ার জন্য। তারা আমেরিকা, রাশিয়ার নাম শোনেনি। হাইড্রোজেন বোমা, অ্যাটম বোমা কাকে বলে তারা জানে না। তারা ন্যাটো, সিয়াটো, কমনওয়েলথ, ইউ এন এ, ইউনেস্কো সম্বন্ধেও অজ্ঞ। কিন্তু—

> দশ বিশ এমনকী পঞ্চাশ বছর পরেও যদি আসা হয়, তবু ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হবে। ওর ছারপোকা পরমায়ু হয়তো অনন্তকাল ওকে টিকিয়ে রাখবে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৪][১২৪]

দেশভাগের পর যে সমস্ত মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছিল, শুধুমাত্র নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই নয়। মনের ভিতর একটা ভয়-শঙ্কা তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল এপার বাংলায়। যেমন—'জবানবন্দী' গল্পে মেনকাকে যে ভয় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু সেই ভয়ের কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল বারবার মেনকার কথাতেই তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

> যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালাল, আমার কুমারী-দেহটা বার কয়েক ধর্ষিত হল, দুর্বৃত্তের হাতে, সেদিন থেকে তিলে তিলে আমার সব গেছে।
>
> পালিয়ে এলাম ভারতে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশা তখনও ছিল। শুনেছিলাম সীমান্ত পার হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওদিকে আশ্রয় আছে মানসম্ভ্রমের মূল্য আছে। সীতার দেশে, সাবিত্রীর দেশে সতীধর্ম অটুট রাখবার কাণ্ডারী আছে। তাই জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এলাম পশ্চিমবঙ্গে। স্থান পেলাম উদ্বাস্তু-শিবিরে। কিন্তু সেখানেও আমার রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। নিরুপায় হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছি। দেহ দিতে বাধ্য হয়েছি নানাজনকে।
>
> দেহটার জন্য আর ভাবনার কিছু ছিল না। অভিজ্ঞতায় জানলাম, সে ভাবনা নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের কাছে অনর্থক শুচিবাই ছাড়া আর কিছু নয়। তবু উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে পালিয়েছি। কারণ টিকতে পারিনি। মৃত আর অথর্ব ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারে না।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫০][১২৫]

শুধুমাত্র উদ্বাস্তু শিবিরেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদেরকে নিয়ে এসে দিল্লিতে পাচার করে দেওয়া হত কিংবা বিক্রি করে দেওয়া হত। তৎকালীন সময়ে সমগ্র দেশজুড়ে সামাজিক ক্ষেত্রে একধরনের নৈরাশ্য, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে পরিত্রাণের রাস্তা ছিল না। মানুষ মানুষের প্রতি ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারাতে থাকে। তাই 'অন্ধকূপ' গল্পে গৌরীকে শেষ পর্যন্ত বলতে শোনা যায়—

> আমার অন্ধকার দূর কর, পাপ ক্ষমা কর। আমাকে শুচি কর। আর একবার আমায় সুযোগ দাও, বিশ্বাসকে লালন করবার। অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যাও। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭][১২৬]

অর্থাৎ মানুষের মনে নিষ্পাপ শিশুর মতো নবজাতক বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। সেখানে বাসা করেছে সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক। কারণ সেই সময় দেখা যায় মধ্যবিত্ত জীবনের দ্রুত অবক্ষয়। যা গল্পাকারে দর্পণে প্রতিবিম্বিত। গল্পটিতে যতীনের স্ত্রী গৌরী কোনওদিন জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়নি। জন্ম থেকে কুনো ব্যাঙের জীবনে অভ্যস্ত গৌরীর পক্ষে মানুষকে বিশ্বাস করা কঠিন। তাই রাত্রির অন্ধকারে ট্রেনের সহযাত্রীকে দুর্বৃত্ত ভাবা তার পক্ষে সহজ।

গৌরকিশোর ঘোষ সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা জটিল মনস্তত্ত্বকে যেমন গল্পের মধ্যে এনে বিশ্লেষণ করেছেন। ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে। কারণ লেখক শুধুমাত্র রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি নন, জীবনের একটি পর্বে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলে পক্ষ থেকে লালমণির হাটে রেলকর্মী ইউনিয়ন পরিচালনার কাজ করেছেন। 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি লেখকের সেই সময়ের অভিজ্ঞতার ফসল। গল্পটি লেখক লেখেন ১৯৫৮ সালে। লেখক ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন যে সমস্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর চেনাজানা হয়েছিল, সেই সমস্ত চরিত্রগুলিই 'সাগিনা মাহাতো' গল্প সংকলনে এসে ভিড় করেছে। রাজনৈতিক কেন্দ্রে থাকা মানুষগুলির সমাজে তাদের অবস্থানটা কোথায় তা 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি পড়লে বুঝতে পারা যায়। একসময় বিপ্লবী দল থেকে কমিউনিস্ট দলে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাসন্দা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন দেব্দা। পার্টির রাজনৈতিক কূটনীতির সঙ্গে বেশিদিন নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া বাসন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ—

বাসন্দার কাছে বিপ্লব মানে গায়ের জোরের প্রদর্শনী হাল রাজনীতিতে তার স্থান কোথায়? প্রকাশ্য রাজনীতিতে বিপ্লবের অর্থ অন্য। গণ-আন্দোলন চাই। জনসাধারণ জাগ্রত হলে ওদের দিয়ে বিপ্লব করাতে হবে। হাতের জোরের স্থান নেই, এখানে শুধু মুখের জোর। গরম গরম বক্তৃতায় লোককে চাগিয়ে তুলতে হবে। এই পার্টিতে বাসন্দার জায়গা কই? যে বাসন্দা হাতে ধরে ধরে এক একজনকে রিক্রুট করেছেন, আজ তারাই প্রধান, বাসন্দা এক পাশে। আজকের পার্টিতে বাসন্দার মূল্য ছেঁড়া মাদুরের মতো।...

সে রাজনীতি এ রাজনীতি নয়। সেদিনের বীরত্ব আজ বোকামো। এখন 'স্ট্রেংথ' নয়, 'ট্যাক্ট'। শুধু বুদ্ধির অসৎ প্যাঁচ আর কুটিল কৌশল। পথ যাই হোক, উদ্দেশ্যসিদ্ধি চরম কাম্য।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩][১২৭]

শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রেষারেষি, ক্ষমতা দখলের লড়াই, ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ। এমনকি উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ।

একটার পর একটা 'সে যাকে'র চোটে মিটিং ভেঙে খান খান হয়ে গেল। গোলমাল হইচই চিৎকার শেয়াল-কুকুরের ডাকে সভাস্থল ভরে উঠল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বাসন্দার কর্কশ অনুনয় আমার কানে এসে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল। 'কমরেড, কেউ যাবেন না, আমার বক্তৃতা শেষ না হলে কেউ যাবেন না, আরও আছে, অনেক কথা বলবার আছে।'...

ভিড় ঠেলে বসন্দার কাছে এগিয়ে যেতে যেতেই ফাঁক হয়ে গেল। বাসন্দা একবার আমার দিকে চাইলেন উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে তার সমগ্র দেহ, গলগল করে ঘামছেন, মুখের দু'কনে ফেনা। মনে হল যেন বৃদ্ধ উচ্চৈঃশ্রবা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাদায় পড়া রথটাকে টেনে তুলতে পারলেন না। অপমানে গ্লানিতে, ব্যর্থতায় হতাশায় মুখখানা কালো করে প্লাটফর্ম থেকে নেমে শ্লথ পায়ে বিপর্যস্ত বিরাট দেহটার অনাবশ্যক ভার টেনে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।[১২৮]

বাসনদা আজ পার্টি নেতৃত্বের কাছে অপাংক্তেয় জীবে পরিণত হয়েছে। পার্টির কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ পদত্যাগপত্র ছাড়া আর কিছু করার নেই। কারণ 'পার্টি একজিক্যুটিভে শিব্দা প্রস্তাব আনলেন, বাসন্দাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩][১২৯]

অন্যদিকে দিনদা চরিত্রটি 'সাগিনা মাহাতো' গল্প সংকলনটিতে বারে বারে ফিরে এসেছে। সেও পার্টি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সে বাসন্দার থেকে ভালো বক্তা, কিংবা শরৎদার থেকে ভালো সংগঠক। দিন্দার রাজনৈতিক কর্মী হয়ে

ওঠার পিছনের ইতিহাসটা ছিল কঠিন। সমাজই তাকে আজকের রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত করেছে। কারণ 'রাষ্ট্রশক্তি যাকে আশ্রয় দেয় না, সমাজ যার উপর অন্যায় করে। তার বিপ্লবী হওয়া ছাড়া আর কি গতি?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬][১৩০] গল্পটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দিন্দার যখন বারো বছর বয়েস, আর তার দিদির বয়স যখন চৌদ্দ, তখন দিন্দার বাবা এক অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। সাহেবদের এক মিলে কাজ করতেন। একদিন কাজের সময় দৈবাৎ মেশিনের মধ্যে ডান হাতখানা ঢুকে যায়। ফলে সেটা কেটে বাদ দিতে হয়। ঘটনার বছরখানেক পর তার বাবা মারা যান। কোম্পানির সততায় বিশ্বাস করে তারা কোনো মামলা করেননি। দিন্দার বাবা মারা যেতেই কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত তার মা কোম্পানির নামে মামলা রুজু করলেন। দুবছর মামলা চলল। জমানো পুঁজি নিঃশেষ হল, জমি-জমা বিক্রি হয়ে গেল। দিন্দার মা একটার পর একটা মামলায় হেরে গেলেন। সেই সঙ্গে তার দিদির বিয়েটা কোনও মতে দিয়ে দেয়। বছর না ঘুরতেই সে বিধবা হয়ে এল। তার মা এ শোক সামলাতে না পেরে মারা গেলেন। দিন্দার পারিবারিক জীবনের কাহিনি এখানেই শেষ নয়। দিন্দাকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল আরেক কঠিন সত্যের মুখোমুখি। নারীদেহ লোলুপ পুরুষ সমাজ দিন্দার বিধবা দিদিকে ভোগ করে সুযোগ বুঝে সরে গেছে সেই পুরষমানুষটি (ডাক্তার)। এবং সম্পর্কও অস্বীকার করেছে। গল্পটিতে ঘটনার সত্যতার বিবরণের আমরা জানতে পারি—

> দিন্দার অসুখের সময় ডাক্তারটা ঘন ঘন ওঁদের বাড়িতে আসত। সেই সময় দিদির সঙ্গে ডাক্তারের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডাক্তার দিদিকে বিয়ে করবে বলে ফুসলিয়েছিল। তারপর দিদির বাচ্চা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ডাক্তার সরে পড়ে। দিন্দা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দিদি ডাক্তারের পায়ে ধরে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন ওকে বিয়ে করতে। অন্তত শুধু বিয়েটা করতে, ডাক্তারের ঘর করতেও চাননি। কিন্তু ডাক্তার সব কিছু অস্বীকার করে বসল। উপায়ন্তর না দেখে দিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। শোনা যায় সে বিষও নাকি ডাক্তারই দিয়েছিল।
>
> দিদি মরবার দিন পাঁচেক পরই ডাক্তার বিয়ে করে বউ নিয়ে এল। আর সেই দিনই নাকি দিন্দা ওকে খুন করতে যান।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬][১৩১]

ডাক্তারকে খুন করার প্রচেষ্টার জন্য দিন্দার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই দিন্দাই হয়ে উঠেছে পার্টির সব চাইতে উগ্রনেতা। লেখক বলছেন—

''উত্তরকালে দিন্দা সব চাইতে উগ্র বিপ্লবী হয়েছিলেন। তাঁর কৈশোরকালের সমস্ত রকম কোমলতা বিসর্জন দিয়েছিলেন মানুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। যে জন্যে আমার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু সমস্ত রকম বৈষম্য সত্ত্বেও দিন্দার প্রতি সমবেদনায় মন ভরে ওঠে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৩][১৩২]

গল্প সংকলনটিতে বাসন্দা-দিন্দা ছাড়া এসেছে করবীদি, শরৎদা, কমরেড নির্মলা সেন ও হৃষীকেষদার মতো চরিত্ররা একদা কমিউনিস্ট দলগুলি বুর্জোয়া ভাবালুতার বিরুদ্ধে আস্ফালন দেখাতে থাকে। অনেক সমালোচকের মতে তা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় ছাড়া আর কিছু নয়।

পলিটিক্স সম্পর্কে শরৎদার মন্তব্য হল—

> পলিটিক্সকে হাত নোংরা করবার অস্ত্র ভাবছ কেন? আমাদের যে জীবন আজ অসম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যে ভরা, অসুন্দর, তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, তাতে সামঞ্জস্য আনতে হবে, সেই জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হবে। তাই না আমরা পলিটিকসে নেমেছি। সেই পলিটিকস যদি নোংরা হাতে কর, তবে কি মহৎ উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে ভেবেছ? কখনই না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২০০][১৩৩]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সমসাময়িক এবং পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পলিটিকসের লোকেরা বিভিন্ন রকম রিলিফ কমিটি খুলে ওপার বাংলা থেকে আসা শরণার্থীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। লেখক তার বর্ণনা দিচ্ছেন—

এই তো সেদিনের কথা। স্পষ্ট চোখে ভাসছে দৃশ্যটা। আমি পার্টি অফিসে বসেছিলাম। দিন্দা, করবীদি, মলয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ স্কোয়াডের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সবাই অল্প বিস্তর উত্তেজিত। টাকা ভালই আদায় হয়েছে স্ট্রিট কর্ণার মিটিং-এ।

এক টাকার নোট আটখানা, খুচরো সাঁয়ত্রিশ টাকা সাড়ে ছ' আনা আর একটা কুড়ি, ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাত মোড়া চুড়ি।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৮][১৩৪]

তারা দুর্ভিক্ষ তহবিলের জন্য বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থসংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ পিড়ীতদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত করবীদিদের মতো ব্যক্তিরা পার্টির কাছে নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পুতুলে পরিণত হয়েছিল। তাই লেখক গৌরকিশোর ঘোষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—''কেন, পার্টি পলিটিকসের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২][১৩৫] শরৎদার মতো মানুষ বলেছিল 'রাজনীতি তো জীবন নয় ভাই, জীবনের একটা অংশ।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৫][১৩৬]

সমাজে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবস্থান মূহুর্তের মধ্যে পরিবর্তন হতে সময় লাগে না। আজ যাকে সম্মান জানিয়ে রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারে, আবার কিছুদিন পরে তাকে চোর অপবাদে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারে। যেমন—শরৎদাকে চোর অপবাদে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শরৎদাকে শহর ঘোরানো হল। পোড়ামাতলা, যুগনাথতলা, বুড়ো-শিবতলা, বাজার, চারচারা পাড়া ঘুরে ঘুরে প্রোসেশন চলল। 'চোর চোর' চিৎকার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শরৎদা জুতোর মালা গলায় পরে চলেছেন। প্রায় চল্লিশ জনের একটা দল তাঁকে ঘিরে চলেছে। আমাদের ইস্কুলের কাছে এসে প্রোসেশনটা দাঁড়াল। ''চোর চোর" চিৎকার হতেই ক্লাসসুদ্ধ ছেলে ভেঙে পড়ল মজা দেখতে! তারাও চেঁচিয়ে উঠল ''চোর চোর"। মনে পড়ল আরে কদিন সকাল বেলার কথা। শরৎদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, এই ইস্কুল থেকে। ওই তো সেই পাঁচিল, দিন্দা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়েছিল, ''শরৎদা কি জয়।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২১][১৩৭]

পার্টি রাজনীতি মানুষকে আর মানুষ থাকতে দেয় না, মানুষের সম্পর্কের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার মোহ। শরৎদাকে পার্টি থেকে 'চোর' অপবাদে বহিষ্কৃত করার পর করবীদি সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

করবীদিই আর একদিন, পার্টি মিটিং-এ শরৎদার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তুলে দেবার প্রস্তাব অকম্পিত কণ্ঠে সমর্থন করেছিল, আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারিনি বলে আমাকে কী তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছিল। শুধু কি তাই, সে প্রস্তাবের একটা কপিও শরৎদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতি কি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে? [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২][১৩৮]

তাই শরৎদার মতো মানুষের মনে হয়েছিল—

তোমরা তো রাজনীতি কর, তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৩][১৩৯]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে বাংলার ধানকল শ্রমিক আন্দোলন, রেলশ্রমিক আন্দোলন বেশি করে সংগঠিত হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

(ক) প্রায় ন' মাস পরে কলকাতায় ফিরলাম। শ্রমিক আন্দোলন করি। পার্টির নির্দেশে সংগঠনের কাজে বাইরে কাটাতে হল এ কয় মাস। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৬][১৪০]

(২) ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জেলে গেলাম রেল-ধর্মঘটের ব্যাপারে। ছাড়া পেলাম মার্চে। প্রায় বছর দেড়েক বাদে কলকাতায় ফিরলাম। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৮][১৪১]

এই সময় পার্টির নির্দেশে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে থাকতে হয়েছে। কারণ শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মানবার দিকে সরকার জোর দিচ্ছিলেন। লেখক তখন নিজে লালমণির হাটে রেলকর্মী ইউনিয়ন পরিচালনায় ব্যস্ত। তিনি গল্পটিতে লিখছেন—

ডি টি এস সাহেবের দুর্ব্যবহারে লালমণির হাটে হঠাৎ ধর্মঘট হয়ে গেল। কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি কেউ আসতে পারলে না। আমাকে ছুটতে হল। লালমণির হাট পৌঁছে দেখি হুলুস্থুলু কাণ্ড। কোথাও শৃঙ্খলা নেই। সারাদিন ছুটোছুটি করলাম। সংগঠনের অফিসে আর ডি টি এস সাহেবের দপ্তরে। সন্ধে পর্যন্ত কোনও মীমাংসা হল না। কোনও পক্ষই গোঁ ছাড়বে না।...মিটমাট হয় কি করে? এদিকে অবস্থা গুরুতর। দু-দুখানা মিলিটারি স্পেশাল আটকা পড়ে গেছে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় রাত আটটা নাগাদ একটা বোঝাপড়া হল। কর্তৃপক্ষ দোষ কবুল করলেন, ক্ষমা চাইলেন। শ্রমিকেরাও কাজে যোগ দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯][১৪২]

আর রেল শ্রমিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে লেখককে এবং কমরেড নির্মলা সেনকে সমস্ত উত্তরবঙ্গ ও আসাম চরকির মতো ঘুরতে হয়েছে চারটে মাস। কারণ বাংলা-আসাম রেলশ্রমিক সম্মেলনের প্রস্তুতিতে। আমরা বাংলা-আসাম রেল শ্রমিকদের প্রসঙ্গই দেখতে পাই 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটিতে। গল্পটির শুরুতেই লেখককে বলতে শোনা যায়—

সাগিনার কথা মনে হলেই ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই হাড়কাঁপানো সকালটার কথা আমার মনে পড়ে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৩][১৪৩]

সগিনা মাহাতো ছিল সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির নেতা। তাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে—

আমি জন্মেছি মধ্যবিত্ত ঘরে। জন্মসূত্রে আমি সেই সুবিধাবাদী পাতি বুর্জোয়াদের শরিক। আর তাই আমার লজ্জা রাখার জায়গা ছিল না। মহাপবিত্র শ্রমিক বংশে কেন আমাদের জন্ম হয়নি, সে আফসোসে আমি মরমে মরে থাকতুম। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৫][১৪৪]

তিনি শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন—

আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বারবার দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর মজদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মনিববাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুর হুকুম।

বই পড়ে কত কি শিখেছিলাম। সর্বহারাই পারে বিপ্লবকে ডেকে আনতে, কারণ সে মরিয়া, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী সংগ্রামের সেরা সৈনিক তাই মজদুর। ওদের নেতৃত্বেই একদিন সারা দুনিয়ায় পতপত উড়বে লাল ঝাণ্ডা।

কিন্তু লেবার ফ্রন্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পাটি সাহিত্যে—কারণ পাতি বুর্জোয়া নাকি সবচেয়ে সুবিধাবাদী, শিবির বদলাতে তারা মুহূর্তের বেশি সময় নেয় না, বিপ্লবকালে এরাই দল ত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায়—যাদেরকে ঘৃণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবর মুভমেন্টের তাবৎ লিডার তারাই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬][১৪৫]

রেলকোম্পানির মালিক ও শ্রমিকদের সমাজে অবস্থান প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

বিদেশি মালিকের বহু অত্যাচার এই রেলপথের শ্রমিকদের সইতে হয়েছে। শীতের দেশ। বর্ষার দেশ। কিন্তু কীসব ভাঙাচোরা কোয়ার্টার। বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ছে প্রতি বছর, শীতে কনকনে বাতাস ঢুকছে। রোগে ভুগে কত মজদুর মারা গেছে। তবু কোম্পানির মালিকরা কোনও প্রতিকার করেনি। আবেদন-নিবেদন দরবার অজস্রবার করা হয়েছে। প্রতিবারই কোম্পানি তা নাকচ করে দিয়েছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪০][১৪৬]

শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে বুড়ো গুরুং-এর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

হাঁ। গরিব আছি, মজদুর আছি। কুলি আছি। খালি লাথ মারছে। তো গোরা হতাম কি ফিরিঙ্গি, আমিও লাথ মারতাম। আর বাঙালি ক্লার্কবাবু হতাম তো জেব্ ভরতাম গরিবের পাকিট মেরে। আচ্ছা বাবা মারো। কোনও সংগঠন তো ছিল না, লিডার ডি না। তো কি করব। আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব তো উ শালা হাসি করছে. কাল ওকে মারছে তো আমি হাসি করছি। হাঁ সচ বাত। বিলকুল সচ। তো কি করব। আমি একেলা

কিছু বলব সাহাবকে তো সব শালা ভাগবে। কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে, সাহাব। দনাদ্দন-পিটবে। নোকরি ডি ফৌরণ খতম। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪১][১৪৭]

এ প্রসঙ্গে সাগিনার মন্তব্য—

দেখ কমরেড, যার ঘরে খানাপিনার দানাপানি আছে তারা দেরি করতে পারে, ধৈর্যও ধরতে পারে। কিন্তু ভুখা নাঙ্গা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়। খেতে দাও, পরতে দাও, কাজ নাও। গোলমাল কেউ করবে না। কিন্তু দানাপানি দেবে না, খালি বাত, খালি ওয়াদা, ওতে কাম চলে না। এবার আখেরি লড়াই হবে। পিছু ফায়সালা। দোসরা রাস্তা আর নেই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৩][১৪৮]

সাগিনা মাহাতোর রেল শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের সমস্যার চির সমাধান করবার জন্য দমননীতির আশ্রয় নিল। ইউনিয়ন বে-আইনি ঘোষিত হল। সে তার অনুচরদের নিয়ে গা ঢাকা দিল। সে আড়াল থেকে ধর্মঘট চালাতে লাগল। সেইসময় একজন মজদুরও কাজে যোগ দেয় নি। কোম্পানি একখানি গাড়িও চালাতে পারল না। সেই সময় রাজ্যের শাসকবর্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। পার্টির তরফ থেকে সাগিনা মাহাতোকে নিখিল ভারত মজদুর ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। এরপর পার্টি অফিস থেকে জবাব আসে সে সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

কমরেড সাগিনাকে পার্টিরই বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ করা হয়েছে। সে সারা ভারতের মজদুরকে সংগঠন করেছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৪৯][১৪৯]

শেষে এক ইউনিয়ন তিন ইউনিয়ন হয়ে গেল। একটা ইউনিয়নের কব্জিমনের দখলে থাকল। আর সেটা পুরোপুরি পার্টির লেবার ফ্রন্ট হয়ে দাঁড়াল। আর দুটো অংশ অন্য দুটি পার্টির কবলে চলে গেল। পার্টির মধ্যে সাগিনার নামে নানা বদনাম বেরোতে লাগল। নিজের দলের মধ্যেই সাগিনা শ্রেণি শত্রুতে পরিণত হল। গুরং, দলবাহাদুর, ওয়াংদিরা পর্যন্ত সাগিনার শত্রুতে পরিণত হল। গুরুং কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে সাগিনার দিকে বলে, 'দেখ শালে, ক্যায়া হালত হুয়া হামলোগোকো। না খানা মিলা না পহেননা। আউর তু বড়ে সাহাব বন গ্যায়া। শালে কো মুখমে থুক ডাল।' থুঃ করে থুথু ছুঁড়ল গুরুং। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫২][১৫০] তারপর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কিল ঘুষি লাথির উত্তাল তরঙ্গে সাগিনা খাবি খেতে লাগল। কতবার উঠতে চেষ্টা করল। কতবার চেষ্টা করল কথা বলতে। কিন্তু বৃথা। সেই প্রচণ্ড মারের বেগ ঠেলে সাগিনা না পারল মাথা তুলতে না পারল টু শব্দ করতে। [তদেব, পৃ. ২৫৩][১৫১]

এখানে লেখক বলছেন—

ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে উঠল যেন। ক্রোধের, ঘৃণার এমন উন্মত্ত রূপ আমি আর কখনও চোখে দেখিনি। আমি থরথর করে কাঁপছি তখন। সাগিনা হঠাৎ নিদারুণ আর্তনাদ করে উঠল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩][১৫২]

পরদিন শুকনা ফরেস্টে সাগিনার রেলে কাটা দেহ পাওয়া যায়। 'রেল লাইনের পাশেই উপুর হয়ে পড়েছিল। কেউ বলে—সে খুন হয়েছে, কেউ বলে আত্মহত্যা করেছে।'[তদেব, পৃ. ২৫৩][১৫৩] তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের শ্রেণি শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এমনকি মানুষ-মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা পর্যন্ত করেনি।

আমরা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করছি সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। স্বাধীনতা পূর্ব, স্বাধীনতা সমসাময়িক বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সমাজের বিভিন্ন সময়ে সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন, তাতে বিশেষ করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তাদের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করলাম। 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটিতে আমরা দেখতে পেলাম রেল-শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকদের আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে শ্রেণি শত্রুর উদ্ভব হওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠেছিল শুধুমাত্র কল-কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুব-ছাত্র আন্দোলন এবং নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৯ সালে ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতাকে লক্ষ

করে লেখক 'আমরা যেখানে' গল্পটি লিখেছেন বলে আমাদের মনে হয়। ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সমাজ বিরোধীতে পরিণত হয় সেটাই দেখিয়েছেন লেখক আলোচ্য গল্পটিতে। গল্পটি দুটি পর্বে বিভক্ত, প্রথম পর্বটি নাম 'বাঘবন্দি'। আর দ্বিতীয় পর্বটির নাম 'তলিয়ে যাবার আগে'। লেখক গল্প গ্রন্থটির সূচনায় জানান—

এ কাহিনির নায়িকা, কলকাতা—যে কলকাতায় এখন প্রচণ্ড হিংস্রতা আর অন্ধ আতঙ্ক। এ দুটি প্রবৃত্তিই প্রবল। আর নায়ক জ্বল সময় ১৯৬৯-৭০। বাকি সব পার্শ্বচরিত্র। [গল্পসমগ্র, পৃ. ভূমিকা][১৫৪]

১৯৬৯-৭০ সাল থেকেই 'ছাত্র-রাজনীতিতে' খুনোখুনির সূচনা। আর তার প্রতিফলনই দেখতে পাওয়া যায় 'আমরা যেখানে' গল্প দুটিতে। গল্পটিতে 'ছোটকোন-তারক' সেই সময়ের সৃষ্টি। এই সময়ের ছাত্র থেকে যুবা সকলের হাতেই বোমা পিস্তল ছুরি। ছোটকোন-তারকদের মতো যুবকদের সমাজবিরোধী হয়ে ওঠার হাতেখড়ি হয়েছিল পরীক্ষা হলে দক্ষযজ্ঞ, পকেটমার বা বাসড্রাইভারকে পেটানোর মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তারপর গুরুর নির্দেশে শুরু হয় বেপরোয়া গুণ্ডাগিরি। এরপর সেই গুণ্ডাগিরি পেশাদারিত্বে পরিণত হয়। আর এই গুণ্ডাগিরির মধ্য দিয়েই তাদের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। ছোটোকাজের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে—

জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ মন্ত্রী রাজনীতিওয়ালা খবরের কাগজওয়ালা প্রোফেসার মাস্টার ডাক্তার কেরানি—সমাজের যারা গারজন তারা গায়ে হাত দেবার আগে ভাবতে বসে। আট ঘাট চিন্তা করতে থাকে। ছোটকোনের গায়ে হাত দেবার আগে নিজেদেরকে কতটা নিরাপদ দূরত্বে রাখা উচিত, অঙ্ক কষতে বসে। সেই ফাঁকে ছোটকোন তার কাজ হাসিল করে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যায়।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৪][১৫৫]

এর মধ্যে রয়েছে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। সমগ্র সত্তর দশকের জুড়ে ছাত্র রাজনীতির চেহারাই ছিল এটা—

একই কলেজে দু'জনের থাকা ঠিক নয়। তাতে রোজ নতুন নতুন ঝামেলা। তারকের সঙ্গে ছোটকোনের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। হয় এ কলেজ ছাড় না হয় দুনিয়া ছাড়। তারক শালা খুব পারটিবাজি করছে এখন, বড় বড় আওয়াজ দিচ্ছে।

....ছোটকোন ওয়াই এম সি এ-তে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ বোমার আওয়াজ শুনল। বেরিয়েই দেখে দুদ্দাড় সব ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। আবার দুটো বোমার আওয়াজ। লোকজন যে যেদিকে পারছে দৌড়চ্ছে। ছোটকোন রেলিং টপকে কলেজের ভিতরে ঢুকেই দেখল তারকের দল শঙ্কর, হরা আর গুপীকে ঘিরে ধরেছে। ইডিয়েট! গুপী একটা বোমা ঝাড়তেই ওদের সামনের ভিড়টা সরে গেল। ছোটকোনও সেই সময় তারকের ডান হাত জলির মুখের উপর একটা বোমা ছুঁড়ল। বোমাটা জলির মুখে নয়, বুকের উপর ফাটল। আর্তনাদ করে জলি লুটিয়ে পড়ল। নতুন দিক থেকে আক্রমণ হতেই তারকরা হকচকিয়ে গেল। সেই ফাঁকে আরেকটা বোমা ছুড়ে পথ পরিষ্কার করে শঙ্কর হরা আর গুপী দৌড়ল। গেটের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইট এসে পড়ছে। ছোটকোন ওদের ডাকল, ''এদিকে আয়''

কে যেন বলল, ''ওই ছোটকোন, মার শালাকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৪][১৫৬]

বিভিন্ন ঝামেলা সম্পর্কে ছোটকোনের নিজস্ব মত, সে বলে—

> জানিস সেজদি, হাঙ্গামা আজকাল ঘাড়ে এসে পড়ে। এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। ট্রামে বাসে ফুটপাতে হাঙ্গামা ওত পেতে থাকে। তুই কি ঘরে দরজা এঁটে হাঙ্গামার হাত এড়াতে পারবি? দেখবি পথের হাঙ্গামা লাফ মেরে তোর ঘরে এসে ঢুকবে। দুনিয়া কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে জানিনে! [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৮][১৫৭]

আমরা এর আগেই বলেছি সমগ্র সত্তর আশির দশক জুড়ে তারক-ছোটকোনদের বাড়বাড়ন্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তারক-ছোটকোনরা যে পথে পা বাড়িয়েছে, সেখান থেকে তার ফেরার আর কোনো পথ নই। এরাই সমাজে একটার পর একটা ইলেকশান পার করে চলেছে (এম. এল. এ, কাউনসিলার, এমনকি কলেজের ইলেকশান), তারাই এম. এল. এ., এম. পি. দের একমাত্র ভরসা, তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবার জন্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। সমগ্র

দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতার মোহে উন্মাদ রাক্ষস হয়ে উঠেছে তাই ছোটকোনকে বলতে শোনা যায়—

> এই যে শালারা পলিটিকস করে, এত ঘন ঘন মত পালটায়, পথ পালটায়, সেই শালাদের ছায়া মাড়াতে চায় না ছোটকোন। ওর এসব ভাল লাগে না, এসব প্যাঁচ পয়জানে ও গুলিয়ে ফেলে নিজেকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬][১৫৮]

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে লক্ষ রেখে তারক বলেছিল—

> এ শালা যা যুগ না। দল একটা চাই। নামমাত্র সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে রাখ ছোটকোন, তারপর যা করছি আমরা তাই করে যাব, বুঝলি, কিন্তু কোনশালা গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। পার্টিতে না ভিড়লেই তুই শালা গুণ্ডা, সমাজ বিরোধী। আর দলে ভিড়ে গেলে সেই তুই শালাই রেভলিউশনারি, বিপ্লবের সৈনিক। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬][১৫৯]

অর্থাৎ গুন্ডামি করার ক্ষেত্রে তারক, ছোটকোনদের পার্টি প্রোটেকশন দেবে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট রাজনৈতিক দল থেকে বলা হয়, তাদের রজত্বে গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। চারিদিকে ছাত্রদের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে লাগল 'সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৬][১৬০] এছাড়া স্কুল কলেজের দেওয়ালে লেখা হতে থাকে ''যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার।'' এবং ''বন্দুকের নলেই ক্ষমতার উৎস'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭২][১৬১] আর ঠিক সেই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে দেখা যায়। আর সেই আন্দোলনের আঁচ এসে পড়েছে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রের রাজনৈতিক পরিবেশের উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। যা গল্পটিতে জলি আর টুকটুকের কথার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

জলির মতে—''ভিয়েতনামে যে সময় সাম্রাজ্যবাদীদের গুলিতে বোমায় হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ পশুর মতো নিহত হচ্ছে, সে সময় নিশ্চিন্ত মনে ক্লাস করার কথা চিন্তা করাও জঘন্য অপরাধ। এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই মদত দেওয়া হবে।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯১][১৬২]

অন্যদিকে টুকটুকের মতে—''ভিয়েতনামের ব্যাপারে তার বলার কিছু নেই। তার আপত্তি কথায় কথায় ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে। যথারীতি ক্লাস করেও ভিয়েতনামের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৪][১৬৩]

এছাড়া রয়েছে চারপাশে নানা ধরনের দুর্নীতি। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং চাকুরিক্ষেত্রে। চাকুরি ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছে সুনীতা। সে বলেছে—

> কংগ্রেসী প্রিন্সিপ্যালের চামচে হয়ে লেগে থেকে কলেজে চাকরি বাগাল। তেল দিয়ে তেল দিয়ে পথের কাঁটা সরাল। এখন শালা জোর কমিউনিস্ট। কায়েমি স্বার্থের উচ্ছেদ চাই বলে প্রিন্সিপ্যালকে ভাগবার জন্য আওয়াজ ছাড়ছে। ঘেরাও চালাচ্ছে। আর কোশ্চেন বলে দেবার নাম করে বড়লোকের মেয়েগুলোকে খালি কুঠিতে নিয়ে গিয়ে ঝাড়ছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৪][১৬৪]

দুর্নীতিই ছোটকোনদের মতো যুব সমাজকে ধীরে ধীরে সমাজ-বিরোধীতে পরিণত করে। তারা মানুষ খুন করার মধ্য দিয়ে নিজের ভিতরে এক ধরনের পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করে। যেমন গল্পটি লেখক ছোটকোন সম্বন্ধে বলেছেন—

> এখন সে পাকা ওস্তাদ। আর তার কোন কিছুতে বাধে না। এক একটা চোট খেয়ে অসহায় শিকারগুলো যখন লুটিয়ে পড়ে, গোঙায়, ছটফট করে, মুখে চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে, ছোটকোন খুব মজা পায়। নিজেকে একটা কেউকেটা বলে মনে হয়। আশেপাশের লোকজন বাড়িঘর ছাড়িয়ে তার মাথা কত কত উঁচুতে উঠে যায়। এই খেলার এইটেই বড় পাওনা। দেখতে দেখতে চারপাশের মানুষগুলো যেন জাদুবলে নেংটি ইঁদুর হয়ে যায়। কী ভয়! কী ভয়! তখন ভালো লাগে। ছোটকোন এই সময়গুলোতে ভালো লাগার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকে।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮][১৬৫]

লেখক আরো বলেছেন—

> পলিটিকস যে বাঘবন্দী খেলা, বাঘ ফাঁদে না পড়ে যাবে কোথায়—ছোটকোন তা জেনেও খেলায় নেমেছে। খেলার শেষে ভয়াবহ মৃত্যু। এইসব ছেলের এই তো পরিণতি। [গল্পসমগ্র, ভূমিকা][১৬৬]

আমরা সেই করুণ পরিণতির চিত্রই দেখতে পাই গল্পটির প্রথম পর্বের শেষে ছোটকোনের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে।

> ও একা রাস্তার উপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ফাঁক। পেট চেরা। হাঁ করা মুখ। একটা চোখ ফুলে বলের মতো হয়ে উঠেছে। প্যান্টটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে ভিতর থেকে অণ্ডকোষ জননেন্দ্রিয় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে ঘোরাঘুরি করছিল। শরীরটায় তাপ ছিল তাই এতক্ষণ কাছে ঘেঁষেনি। একেবারে ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে উঠতেই সে এগিয়ে এল এবং মুখের জমাট রক্ত জিভ দিয়ে চক চক করে চেটে চেটে সাফ করতে লাগল।
>
> পথে আবার লোকজন স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করল। দু-একজন চলতে চলতে দৃশ্যটা একবার দেখল। একজন বলল,''যেমন শালা আমাদের পুলিশ, তেমনি আমাদের কর্পোরেশন, শালা সেই কখন থেকে ডেড বডিটা গলিতে পড়ে আছে, এখনও পর্যন্ত কেউ সরাল না।
>
> আরেকজন সিগারেটে একটা সুখ টান দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বললে, ''এ তো রোজই চলছে, ভাই। কত আর সরাবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৫][১৬৭]

গল্পটির দ্বিতীয় পর্বে 'তলিয়ে যাবার আগে' অংশটিতে আমরা দেখতে পাই সমাজের গুন্ডা-মাস্তানরা সবাই তলিয়ে যাচ্ছে। আর এরজন্য দায়ী আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। সমাজের সমস্ত অসামাজিক কাজে লিপ্ত যুব সমাজ তারা প্রায় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এরা পেশাদার গুন্ডা। না হলেও হিংস্রতা বা নৃশংসতায় সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে যায়। অথচ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিদেরই বলতে শোনা যায়—

> আমি একটা কিছু করতে চাইছিলাম, সামথিং পজিটিভ। কিন্তু একা আমি কী করব, ওয়ান এগেনস্ট সো মেনি? কি করতে পারি? ইটস এ বিগ্ র‍্যাকেট।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪][১৬৮]

গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই যে, লিলিকে তিনজন গুন্ডা ধরে নিয়ে যায়। এবং নিয়ে গিয়ে পাঁচদিন ধরে লিলির উপরে তারা নৃশংস পাশবিক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতে থাকে। তারা লিলির স্বামী অসিতের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ দাবি করেনি। তাদের তিনজনেরই বয়স তেইশের কাছাকাছি। লিলির তাদেরকে দেখে মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হয়েছে। সমাজ তাদেরকে চির হতাশ বঞ্চিতের দলেই রেখে দিয়েছে। বঞ্চিত হতে হতে তাদের জীবন হতাশায় ঘিরে ধরেছে। ছেলে তিনটির বর্তমান অবস্থার জন্য লিলি দায়ী করেছে সমাজকে। বর্তমান সমাজ সম্পর্কে লিলির মন্তব্য—

> সমাজে ন্যায় অন্যায় বোধ যতদিন টিকে ছিল, সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যতদিন একটা সম্ভ্রমের ভাব ছিল, পুলিশ সম্পর্কে একটা ভয় ছিল, ততদিন এইসব বঞ্চিতদের প্রবৃত্তি নানা জটিল শিকলে বাঁধা থাকত। তাই আমরা সুবিধাভোগীরা আমাদের জগতে নিরুপদ্রবে চলাফেরা করেছি। আজ শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে, তাই ওদের প্রবৃত্তির শিকল আলগা হয়ে গিয়েছে, ছিড়ে ফেলেছে ওরা। তাই আজ ওরা যা চাইছে, থাবা মেরে কেড়ে নিচ্ছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১১][১৬৯]

অন্যদিকে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে লিলির স্বামী অসিতের মন্তব্য—

> আজকের সমাজে একা কে কী করতে পারে? সমস্যাটা সম্পূর্ণত ল অ্যান্ড অর্ডারের। নয় কী? ব্যর্থতা সরকারের। আমরা ভোট দিই, ওরা সরকার গড়ে। উই পে ট্যাকসেস, ওরা সরকার চালায়। সরকারের পুলিশের এটা দেখা ডিউটি যে, আমরা, ইন্ডিভিজুয়ালরা যেন নিরাপদে থাকি। আমার বউ যেন লাঞ্ছিত না হয়, আমার সম্পত্তি

যেন লুণ্ঠিত না হয়, আমার অধিকার যেন সবলের পদাঘাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। এই হচ্ছে সভ্য সমাজের কানুন। দিস ইজ এ কাইন্ড অব এ কনট্রাক্ট। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩২০][১৭০]

এইরকম হতাশাগ্রস্ত, নিয়মনীতি বিহীন, আইন-শৃঙ্খলাহীন সমাজ ব্যবস্থায় দাড়িয়ে লিলি-অসিতের মতো যে-কোনো বাবা-মার দাবি, আগামী দিনের সন্তান যেন শুধুমাত্র দুধে-ভাতে নয়, তারা যেন পায়ের তলায় শক্ত মাটির আশ্রয় পায়। যেমন গল্পটিতে লিলিকে বলতে শোনা যায়—

জানো অসিত, আমাদের বাচ্চাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, সে যেন প্রথম থেকেই তার পায়ের তলায় শক্তি মাটির আশ্রয় পায়। তা হলেই, তুমি দেখো অসিত, ও আর কিছুতেই ভয় পেয়ে পালাবে না। ও রুখে দাঁড়াবে। ও ঠিক পারবে, তুমি দেখো।

...শিক্ষাটা এমন দিতে হবে, ও যেন বুঝতে পারে ও দৈববলে বলীয়ান। অন্যায়ের শক্তি যত বিরাটই হোক, ওর কাছে পরাজয় তাকে মানতেই হবে। এই বিশ্বাস মনে যদি একবার শক্ত হয়ে জমে বসতে পারে, তবে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক সে রুখে দাঁড়াবেই।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১৬][১৭১]

লেখকের অন্য আরেকটি গল্প 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হাহা' গল্পটিতে আমরা পূর্ব গল্পের ছায়া দেখতে পাই। অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শহর কলকাতার সমাজ জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে যে যে পরিবর্তন হয়েছে তা ধরা পড়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদরণী হা হা' গল্প সংকলনের গল্পগুলিতে। এই গল্প সংকলনটি সম্পর্কে বিমল কর বলেছেন—'a sense of the present in its essence.' [গল্পসমগ্র, ভূমিকাংশ][১৭২] গল্পগুলিতে লেখক যে বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার চিত্র এঁকেছেন, তা সত্যিই বাস্তব। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমগ্র সমাজ জুড়ে বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বহীনতা ও স্বেচ্ছাচারী অবস্থা লক্ষ করা যায়। সমগ্র সমাজ জুড়ে সমাজ বিরোধী গুন্ডা মস্তানদের দাপাদাপি তার পূর্বাভাস আমরা আগের গল্পেই পেয়েছি। এই গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'হঠাৎ জোয়ার' গল্পটিতে শুরু হয়েছে প্রায় একই ঘটনার মধ্য দিয়ে।

কাঁদানে গ্যাসে প্রথম শেলটা একটু দূরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বাসের জানালা থেকে স্পষ্ট দেখল বিজলী। রাস্তার মাঝ বরাবর জিনিসটা এসে পড়ল। ফাটল। কিছু লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। ঘন জমাট ধোঁয়া পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠতে না উঠতেই একটা কম বয়সী ছেলে স্টোকে চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিল। ছুঁড়ে মারল উল্টো দিকে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। [হঠাৎ জোয়ার, পৃ. ৩৪৩][১৭৩]

বিজলী দেখতে পেল রাস্তায় একটা লোক নেই। ছাদে না, বারান্দায় না। তারই মধ্যে সে কিছু যুবকের কথা সে শুনতে পেল। তারা পালানোর রাস্তা খুঁজতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল—

তিন সাইডেই পুলিশ। শালারা খচে ব্যোম হয়ে আছে। নাগালে পেলে আর আস্ত রাখবে না। আমরা অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গিয়েছি।

একটা ছেলে গলির মুখটা দেখে এসে বলল, গুলি চলছে। চ, ওধার দিয়ে পালাই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪৫][১৭৪]

বিজলী ভাবতে লাগল এই গলির রাস্তাটার মতোই তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের জীবনও অন্ধকারে ভরা। যতই লাফালাফি করুক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, ঠিক তারা যে গলিটাতে দাঁড়িয়ে আছে, সেই গলিটার মতো।

চারিদিকে খালি হতাশা, নৈরাশ্য, একাকীত্বের যন্ত্রণা আর মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। এই একাকীত্বের যন্ত্রণা হতাশা বিচ্ছিন্নতাবোধ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের লেখনীতে অনেকদিন আগেই ধরা পড়েছিল। যেমন—কথাকার মেটামরফসিসের গল্পের কথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। কথাকার মেটামরফসিস গল্পের মতোই আমাদের আলোচ্য লেখকের 'আরশোলা' গল্পটি। 'আরশোলা' গল্পের নায়কের মধ্যে একাকীত্ব, নৈরাশ্য, হতাশা ঘিরে ধরেছে। তার মনে হয়েছে—

শিরদাঁড়াটা খুলে নাও। তা হলে বুকে হাঁটতে আর আমাকে কসরৎ করতে হবে না। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪৫][১৭৫]

এছাড়া তার আরোও মনে হয়েছে—

আরশোলা হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধে। ভয় পেলে সেটা চাপা দেবার জন্য মানুষের মতো এখানে ভড়ং মেরে সিংহ সাজবার দরকার হয় না। এখানে যারা ভয় পায়, তারা সকলের সামনেই ভয় পায়। তাতে সময় থাকতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫৭][১৭৬]

গল্পের কথক বর্তমান সময়কে সামনে রেখে তিনি আরো মনে করেছেন, অন্যের পিছনে কাঠি দিয়ে আমোদ করা, এ কাজ শালা একমাত্র মানুষ জাতের পক্ষেই সম্ভব।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫৯][১৭৭] সে আরোও বলেছে—

ভাবের ঘরে চুরি করতে মানুষের চেয়ে ওস্তাদ তো আর কেউ নেই। নিছক যুক্তি মানুষকে কী দিয়েছে? দিয়েছে বিজ্ঞান, দিয়েছে সংগঠন। বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত কী দিয়েছে? ব্যাপক ধ্বংসের আণবিক হাতিয়ার। নাও শালারা, এবার দনাদ্দন ফাটাও বোমা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬০][১৭৮]

মানুষ এমন এক অস্থিরতাময় সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে, তার নিজের মেরুদণ্ড থেকেও সে আরশোলার মতো মেরুদণ্ডহীন। মানুষের মনের মধ্যে একটা ভয় বোধ সবসময় কাজ করে চলেছে। সে ভয়ে ভয়ে জীবনধারণ করছে তাদের মনের মধ্যে সবসময় একটা আশঙ্কা কাজ করে চলেছে। এই বোধ হয় একটা নিদারুণ বিভীষিকা তাদেরকে গ্রাস করার জন্য পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বলেছেন—

যুক্তিশীলতার আরেকটি অবদান হল মানুষের জটিলতম সামাজিক সংগঠনের গ্যাঁড়াকল। এই জটিল যান্ত্রিকতার লেবেলের নামই আবার সভ্যতা। সভ্যতা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। এমন চূড়ান্ত অসভ্যতা কেউ কখনও দেখেছে?....অস্তিত্বের স্বাভাবিক পটভূমি থেকে অনেক রংবাজি করে তো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। জটিলতার এই বিরাট মোয়া এখন হাতের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। একাকীত্বের অনাদ্যন্ত অসহায় শূন্যতার এখন যাও শশা-ত্রিশঙ্কুর মতো ঘুরপাক। সুখ মেটাতে রংবাজি করেছ। এখন জ্বালা মেটাতে জন্মভর ফুঁ দিতে থাক। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬১][১৭৯]

আমাদের সমাজে 'সংসার' নামক প্রতিষ্ঠনে আমরা সবাই এক জটিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। সংসারে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষগুলো কঠিন মুখোশের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখেছে। সংসারের প্রত্যেকটা সম্পর্ক যে আলাদা আলাদা ছাঁচে ঢালাই করা তা লেখক 'চার প্রৌঢ়ের বারমাস্যা' গল্পটিতে দেখিয়েছেন।

সন্তান/ছেলে ও মায়ের সম্পর্ক = স্নেহ ও শর্তহীন ভালোবাসা।

এই সম্পর্কের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

আমার ধারণা মা যদি থাকত, মা যদি দরজা খুলে দিত সেদিন, চোখ দুটো আমার অমন লাল টকটকে দেখত, চেহারাটা ঝড়ো কাক আর সারাগায়ে টিয়ারগ্যাসের গন্ধ, তা থমথম করত, শুধোত, কী রে, খোকা কী হয়েছে! শরীর ভাল আছে তো। সেই মুহূর্তে আমার শরীরটা জুড়িয়ে যেত। মনের ভিতর বসে বসে সারাদিন ভয়ডরের কাপুরুষতার যে সব বীজানুগুলো আমার প্রাণকোষে কুটকুট করে কামড় মেরে মেরে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, সেই মূহূর্তে আমি তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আমার ভাল লাগত, বেশ ভাল লাগত। আমি মাকে বলতাম, না না অসুখ বিসুখ কিছু নয়। আজ পুলিশের সঙ্গে আমাদের সারাদিন ফাইট হয়ে গেল কিনা। খুব টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে। আমাদের তো প্রায় দম বন্ধ হবার অবস্থা। আমার বিশ্বাস মা আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলত, ওমা, সে কী। তোর গোঁয়ার্তুমি আজও গেল না। না বাবা তুই আর এর মধ্যে থাকিস না। তোর বয়স হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে, তোর আর এসব সাজে না। আমার গা ছুঁয়ে বল, তুই কক্ষনো আর এসবের মধ্যে জড়াবিনি। বল, বল আমার মাথার দিব্যি। আমার মার এই বাঁধভাঙা আকুলতা আমাকে ভুলিয়ে দিত যে, সারাদিন আমি দরজা জানালা আঁটা ঘরে ল্যাজগুটিয়ে লুকিয়েছিলাম আর মাঝে মাঝে পুলিশ দূরে সরে গিয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার পর দুরুদুরু বুকে সহকর্মীদের পিছন থেকে জানালা দিয়ে উঁকি মারছিলাম।

মার উদ্বেগ কিছুক্ষণের জন্যও আমাকে, ক্লাস থ্রি কেরানিকে বই-এ পড়া ক্ষুদিরামে পরিণত করত। আমি হয়তো বলতাম, তুমি বলছ যখন, এখন আর কিছুর মধ্যে থাকব না। কিন্তু জান তো মা অন্যায় দেখলে আর স্থির থাকতে পারিনে। ঘর সংসার ভুলে যাই। রক্ত টগবগ করে ফোটে। তখন ভাবি যায় যাবে জীবন চলে বন্দেমাতরম বলে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭০][১৮০]

(খ) সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক = শর্তাধীন ভালোবাসা ও দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা।

এই সমাজের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

ধর আরেকদিন টিয়ারগ্যাস খেয়ে বাড়ি গেলে, শরীরটা আর বইছে না, কী, বেদম মাল টেনে গিয়ে কড়া নাড়লে, আর দাঁড়াতে পারছ না, শুতে পারলে বাঁচো, এমন অবস্থায় বউ দরজা আগলে দাঁড়ালে, তুমি ঢুকতে যাবে, বউ জিজ্ঞেস করল, ঢুকছ যে বড়। মাশুল কোথায়? তুমি বললে, মাশুল? বউ বলল, হ্যাঁ, পাখিটা কই? তুমি বললে, পাখি? বউ বলল, হ্যাঁ, ভালবাসা। ভালবাসা কোথায় রেখে এলে? এবার বল, কী জবাবটি দেবে? —সাবধান, সাবধান, সাবধান। মালের মুখে হুটপাট করে কোনও জবাব দিতে যেও না। আমার মতো বোকা বনে যাবে। তোমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।

—কিন্তু সময় থাকতে জবাব একটা তৈরি করে রাখা ভাল। প্রশ্ন একদিন আসবেই। আজ যে আসছে না, তার কারণ বউরা যে নানা জিনিস নিয়ে মেতে আছে। কেউ রান্নাঘর, কেউ ছেলেপুলে, কেউ শাড়ি, কেউ গয়না, কেউ নিজের মুখ, কেউ বুক, কেউ বা গতরের গর্ব নিয়ে। কেউ মেতে আছে ভাড়া-করা প্রণয়ী নিয়ে। ঠ্যাকার নিয়ে, গুমোর নিয়ে, ঈর্ষা বিদ্বেষ নিয়ে, কেউ গাড়ি, কেউ সোসাইটি, কেউ বা শুধু তাজা ক্ষুধা নিয়ে। একদিন যখন জাগবে, যখন বুঝবে সবই তাদের প্রাসাদে বাস, তখন দেখ কী কেলেঙ্কারিটা হয়। দিন নেই, রাত নেই, স্বামীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের তাও শলাকাটি নিয়ে। পড়পড় করে গায়ে ফুটিয়ে তাদের জাগিয়ে নেবে, তারপর কাঁচাঘুম ভাঙার জ্বালায় তারা যখন অস্তির, তখন জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাকে ভালবাস? কি জবাব দেবে তখন? [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭১][১৮১]

সমাজে সাধারণ সম্পর্কগুলোকে দেখাতে গিয়ে লেখক বলেছেন

কী হবে কী? লোক সচেতন হবে। সাবধান হবে। উদ্যোগী হবে ভালবাসতে। অভ্যাসে অভ্যাসে ঘষে ঘষে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়িয়ে গেছে যে, এ সম্পর্কে কেউ সচেতনই নয়। কেউ না। সংসারে ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচা ঝুলছে, সবাই তাকে ভাবছে বউ। ভিতরের পাখিটি যে উড়ে গেছে, কেউ একবার উল্টেও দেখছে না। এর পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, ভেবে দেখেছ? [সমগ্রন্থ,, পৃ. ৩৭০][১৮২]

ধর্মের ভিত্তিতে সমাজে মানুষের অবস্থান নির্ণীত হয় তা আমরা আগেই জানি। বা সমাজে জাতিভেদপ্রথা বা বর্ণবৈষম্যের কথা আমরা আগেই পড়েছি। কিন্তু বর্তমান সময়ে কর্মক্ষেত্রের কাজের শ্রেণি বিচারের মাধ্যমে সমাজে মানুষের অবস্থান ঠিক করা হয়। মানুষ মানুষকে নিয়ে প্রতিনিয়ত খেলায় লিপ্ত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই খেলার খেলাঘর একদিন ভাঙবেই। তিনি গল্পটিতে বলেছেন—

সব খেলা একদিন ভেঙে যাবে,...সব ঘুচে যাবে। থাকবি শুধু তুই আর তোর নিয়তি, একেবারে মুখোমুখি। সেদিন বুঝবি, খেলা খেলে চিরকাল চলা যায় না। একদিন না একদিন ধরা পড়ে যেতেই হয়। সেদিন নিজের উপর নজর পড়ে।...সেদিন অফিসে গিয়েছি। শুনলাম স্ট্রাইক হবে। শোনামাত্র শরীরের রক্ত অকারণে তিরতির করে উঠল। ষোলোটা বছর একটানা কাজ করে এসেছি। অথবা ফাঁকি মেরে এসেছি। যাই করে থাকি। অফিসে আমি সর্বস্নেহধন্য মালিক আমাকে স্নেহ করেন, চতুর্থ শ্রেণীর নিম্নতম কর্মচারীটিও আমাকে স্নেহ করে। যাকে ডিঙিয়ে আমি দ্বিতীয় শ্রেণী 'ক'-তে প্রোমোশন পেয়েছি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন, আমাকে ডিঙিয়ে যাঁরা পুরোপুরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছেন, তাঁরাও আমাকে স্নেহ করেন। আমি যেন স্নেহ নামক পদার্থটির একচেটিয়া মজুতদার সে ভারী এক রগরগে খেলা। আমি যেন আপিসের পোষা ভাঁড়। তাই রক্তের

অস্বস্তির উপশম ঘটাতে যখন চতুর্থ শ্রেণীর দাবির প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর সমর্থন সূচক ব্যাজ আঁটলাম ''দ্বিতীয়-ক'' শ্রেণীর বুকে, সেদিন সবাই মজা পেল। ধর্মঘটের দিন যেন ক্লাস প্রোমোশনের রেজাল্ট জানাতে যাচ্ছি, তেমনি রক্তের চঞ্চল তুফানে পাল তুলে সাতসকালে অফিসে পৌঁছালুম। সামনের ফুটপাতে চাঁটাই পেতে চতুর্থ শ্রেণির ধর্মঘটীরা বসে আছেন। চতুর্থ শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের নারকেলকাতা হবার দায়িত্ব আমার ঘারে কে যেন চাপিয়ে দিলে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল, এখানে আমার একটা ভূমিকা আছে। ষোলো বছর পর টের পেলুম আমার হৃৎপিণ্ড এখনও শিরা উপশিরায় জোয়ার তুলতে পারে। অনেকদিন পরে ভারি ভাল লাগল। সকলের মধ্যে জায়গা নিয়ে বসে পড়লাম। বসলাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম, চালে ডালে মিশ খায়নি। কারও চোখ ভাবলে ব্যাটা মালিকের দালাল নয় তো? কারও চোখ স্নেহ ঢেলে বললে, আরে, এ লোকটা দিলদার আছে, থাকতে দাও। বসে বসে আকাশ দেখলাম। রাস্তার জনস্রোত দেখলাম। দূর থেকে যাকে জনস্রোত ভাবতাম, কাছে বসে দেখলাম, তারা আলাদা আলাদা মানুষ। প্রত্যেকের চলার ছন্দ, পা ফেলার কায়দা আলাদা। ওরা আলাপ করছিল, মাইনে কাটা যাবে কিনা, ভয় পচ্ছিল কেউ কেউ। আবার মাঝে মাঝে সমবেতভাবে জিগির তুলে ভয় তাড়াচ্ছিল, সাহস আনছিল। একটা সাধারণ প্রতিপক্ষ খাড়া করে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে নিজেদের এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভারি সুন্দর এক খেলাঘরে বিচিত্র খেলনা ছড়িয়ে নিয়ে আমি খেলতে বসেছি। হঠাৎ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, এই খোকা তুমি এখানে কি করছ। তবে হয়তো এক ছুটে পালিয়ে যেতুম, ধরা পড়ার লজ্জা ঢাকবার জন্য। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭৭][১৮৩]

বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে আমাদের সমাজে অস্থিরতা লেগেই ছিল। কোনো না কেনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষ লেগেই ছিল। তাছাড়া কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ দাঙ্গা লেগেই থাকত। যার ফলে সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সে চিত্র আমরা দেখতে পাই 'যাহা যায়' গল্পটির মধ্য দিয়ে।

দুদিক থেকে দুটো মিছিল এক সঙ্গে ঢুকে আটকে গেল। বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট রিকশা লরি, ঠ্যালা টেম্পো আর মানুষ, মানুষ মানুষ মানুষ, মুখ বন্ধ হওয়া বেসিনের জল যেন ফুলে ফেঁপে উঠল। ব্যান্ডের বাদ্য, গাড়ির হর্ন চিৎকার চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে রাণুকে অবসন্ন করে তুলল। বেজায় অস্বস্তি হচ্ছিল তার। এমন সময় দমাস করে একটা বোমা যেন তার হৃদপিণ্ডের ঠিক উপরে এসেই ফাটল। চোখে সে অন্ধকার দেখল। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা, বিকট শব্দে জায়গাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।...যে যেদিকে পারল ছুটল।

দুই মিছিলের দাঙ্গা এত দ্রুত এবং এত বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল...। [যাহা যায়, পৃ. ৩৯৮][১৮৪]

আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে সব দিক থেকে সঙ্কট গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষ তার বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রতিবাদ গড়ে তুলছে না। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন বলে মনে করছেন আমাদের লেখক। ১৯৭৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ এক ঝাঁঝরা প্রমোদ তরণী এবং তার মধ্যে কলকাতা এক নড়বড়ে শহর। যেখানে কোনও নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, চারিদিকে খালি অরাজকতা। আর কলকাতা শহরের ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলো অরাজকতাকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। লেখক বলেছেন—

হিটলারের জার্মানিতে যেমন মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, ভয়ে বিচার বুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল, সব কিছু খুইয়ে মানুষ সে দিন শুধু বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তেমনি অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের। [গল্পসমগ্র, ভূমিকাংশ][১৮৫]

তিনি বলতে চেয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করার মধ্যে শুধু অসহায়তাই প্রকাশ পায় তাই নয়, তা বিবেক-বিবেচনা বিসর্জনের নিদর্শনও বটে। আমাদের আলোচ্য 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হা হা' গল্পটিতে প্রোফেসর হেলমূট ১৯৭০ সালের কলকাতার নানান ধরনের অরাজকতার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রফেসর

হেলমূট বলেছেন, কলকাতায় খুন, জখম, লুঠেরাদের উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর সেই সঙ্গে লুঠেরাদের দাবি-দাওয়া ক্রমশ হয়ে উঠছে আকাশ-ছোঁয়া। তিনি আরও বলছেন—

> কখনও পুজোর চাঁদার নাম, কখনও পারটির চাঁদার নামে জুলুম বেড়েই চলেছে। ফলে বাসওয়ালারা বিনা নোটিসে বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। খুন জখম বাড়ছে, স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে মারছে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে। বাড়ি চড়াও হয়ে খুন করছে। স্কুলের শিক্ষিকার বুকে বিঁধছে ছুরি। সবাই আমরা চুপ করে আছি। মুখ বুজে সব জুলুম হজম করে যাচ্ছি। আর মাথা তুলতে সাহস পাইনে কেউ। খাচ্ছি, দাচ্ছি, রমণ করছি আর সিনেমা দেখছি, আর চায়ের দোকান, কফি হাউসে জাঁকিয়ে বসে রাজা উজির মেরে চলেছি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১৬][১৮৬]

অর্থাৎ লেখক বলতে চাইলেন, সত্তর-আশির দশকে সমগ্র কলকাতা প্রায় মাস্তানদের দখলে। তারা রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে অফিস-কারখানা, ইস্কুল, হাসপাতাল, হাট-বাজার, সিনেমা-থিয়েটার, সঙ্গীতের জলসা এমনকি খেলার মাঠ পৃর্যন্ত খালি তাদেরই আধিপত্য। গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন—

> কলেজের প্রিনসিপ্যাল উদভ্রান্তের মতো এগিয়ে এলেন। বললেন, ল্যাবরেটরি ভেঙে তচনচ করে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল বারোজন। আমার কলেজে? অধ্যাপক ত্রিশজন, ছাত্রসংখ্যা সাড়ে সাতশো আর অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা সাতাশ। আর দারোয়ান মালী দশজন।
>
> প্রধান শিক্ষক উদভ্রান্তের মতো এগিয়ে এলেন। কাতরভাবে বললেন, পরীক্ষার হল ভেঙে তচনচ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল দশজন। পাঁচশো ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১][১৮৭]

এই সমস্ত মাস্তানদের শিক্ষিত সমাজ 'সমাজ বিরোধী' আখ্যা দিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই সমস্ত 'সমাজবিরোধী'দের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। অথচ আমাদের সমাজের যারা বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক প্রত্যেকেই বিষয়গুলিকে দেখে ও বুঝেও সাধারণ মানুষের পাশে না দাড়িয়ে ভয়ে নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারাতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। আর এই বিষয়টাকে ব্যঙ্গ করে লেখক বললেন—'এই কলকাতায় এখন শুধু বেশ্যারাই নির্ভয়।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২][১৮৮] আর এটাই ছিল তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গৌরকিশোর ঘোষের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। ১৯৭১ সালের পর থেকে নাকি গৌরকিশোর ঘোষের আর কোনও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাঁর গল্পলেখনী বন্ধী হয়ে যায়নি। কিন্তু তাঁর গল্প বলার ধরন পাল্টেছে। তাঁর অপ্রকাশিত গল্পের সংখ্যা আমাদের জানামতে বারোটি। গল্পগুলিতে বাইরে কাহিনি যতটা না প্রভাব ফেলেছে, তার থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে অন্তর্মুখী ভাবনা। অনেক সাহিত্য সমালোচকের মতে, 'গল্পগুলিতে বাইরের কোনও চমক নেই। প্রায় স্বগতোক্তির মতন গলার স্বর না চড়িয়ে, রঙের ব্যবহার যথাসাধ্য কম রেখে, আত্মকথন। রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, সে কি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে? একদা কবিতা লিখতেন আবার কী সেই কবিতা ফিরে এল।' [গল্পসমগ্র, ভূমিকাংশ][১৮৯] এই সমস্ত গল্পগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের ভিতরে আরেকটি গল্প লুকিয়ে ছিল। গল্পগুলির চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখকের নিজের আত্মবিশ্লেষই ফুটে উঠেছে। তাই আমরা লেখকের সেই সমস্ত গল্পগুলিকে এখানে আর বিশ্লেষণ করলাম না। পরে কোথাও সুযোগ হলে লেখকের অগ্রন্থিত গল্পগুলিকে নিয়ে আলোচনা করব। তবে লেখকের সমস্ত গল্পগুলিকে পাঠ করে আমরা বলতে পারি তাঁর সৃষ্ট গল্পগুলি যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে এক সার্থক সৃষ্টি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. গৌতম রায়, রাজনীতির প্ররোচনা, ধর্মের ঘাতকরূপ, একক মাত্রা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৩।

২. শৈবাল মিত্র, এই উপমহাদেশ, ক্রশবিদ্ধ যীশু, একমাত্রা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৯।

৩. গৌরকিশোর ঘোষ, জলপড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮ পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ২১।

৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫।

৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২।
৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯।
৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪।
৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১।
৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৬।
১০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৮।
১১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৯।
১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১৭. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮।
১৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮।
১৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
২০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
২১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১।
২২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯।
২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬।
২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩।
২৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩।
২৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৪।
২৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৫।
২৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৮।
২৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৯।
৩০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৭।
৩১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০৭।
৩২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩।
৩৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫।
৩৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৩।
৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৩।
৩৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৪।
৩৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।
৩৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮।
৩৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
৪০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
৪১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
৪২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৩।
৪৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪-৩০৫।
৪৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪।
৪৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩২৫।
৪৬. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ৫০-৫১।
৪৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৬।
৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৬।
৪৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২।
৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২।
৫১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩।

৫২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩।
৫৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩-১২৪।
৫৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৪।
৫৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩।
৫৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭।
৫৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭।
৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৯।
৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭০।
৬০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৬।
৬১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৬।
৬২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০০।
৬৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪।
৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪।
৬৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৮।
৬৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩০।
৬৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩০।
৬৮. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
৬৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা অনুবাদ টীকা, মনুসংহিতা। মনুস্মৃতিতে নারীর স্থান, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৯১।
৭০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
৭১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
৭২. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, পৃ. ২১৩।
৭৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৩।
৭৪. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬।
৭৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫ তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৬৭।
৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬।
৭৭. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮, সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর, ২০১২, ভূমিকা পৃ. ৩।
৭৮. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, এই দাহ, পৃ. ৬২।
৭৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬২।
৮০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯।
৮১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৩।
৮২. সমগ্রন্থ, 'মনের বাঘ', পৃ. ৯৩।
৮৩. সমগ্রন্থ, 'মনের বাঘ', পৃ. ৯৪।
৮৪. সমগ্রন্থ, 'মনের বাঘ', পৃ. ১৬০।
৮৫. সমগ্রন্থ, 'মনের বাঘ', পৃ. ১৬০।
৮৬. সমগ্রন্থ, 'মনের বাঘ', পৃ. ১৬১।
৮৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬১।
৮৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৮।
৮৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৯।
৯০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৭০।
৯১. সমগ্রন্থ, 'লোকটা' পৃ. ১৮৯।
৯২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৫।
৯৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০৪।
৯৪. সমগ্রন্থ,
৯৫. সমগ্রন্থ, 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে', পৃ. ২৪৬।
৯৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২।

৯৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২।
৯৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৭।
৯৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৮।
১০০. সমগ্রন্থ, 'একধরনের বিপন্নতা', পৃ. ৩৩৯।
১০১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪২।
১০২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭১।
১০৩. সমগ্রন্থ, 'কমলা কেমন আছে', পৃ. ৪১৯।
১০৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৯।
১০৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৮২।
১০৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২০-৪২১।
১০৭. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'এই কলকাতা' পৃ. ৩।
১০৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০।
১০৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩।
১১০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৪।
১১১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬০।
১১২. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'শিকার', পৃ. ৮৩।
১১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৮।
১১৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৯।
১১৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯০।
১১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
১১৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
১১৮. গৌরকিশোর ঘোষ গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ম্যানেজার', পৃ. ১২০।
১১৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২০।
১২০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৭।
১২১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮।
১২২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩০।
১২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৩।
১২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৪।
১২৫. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'জবানবন্দী', পৃ. ১৫০।
১২৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭।
১২৭. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১, 'সাগিনা মাহাতো', পৃ. ১৮৩।
১২৮. সমগ্রন্থ, পৃ.।
১২৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩।
১৩০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬।
১৩১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬।
১৩২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৬।
১৩৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০০।
১৩৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৮।
১৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২২।
১৩৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৫।
১৩৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২১।
১৩৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২২।
১৩৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৩।
১৪০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৬।
১৪১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৮।
১৪২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
১৪৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৩।
১৪৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬।
১৪৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬।

১৪৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪০।
১৪৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪১।
১৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৩।
১৪৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৯।
১৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫২।
১৫১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩।
১৫২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩।
১৫৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩।
১৫৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করম মে, ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ভূমিকা'।
১৫৫. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'আমরা যেখানে', প্রথমপর্ব—'বাঘবন্দী', পৃ. ২৬৪।
১৫৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৬
১৫৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৮।
১৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬
১৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬।
১৬০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৩।
১৬১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭০।
১৬২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
১৬৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
১৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।
১৬৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮।
১৬৬. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ভূমিকা'।
১৬৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯৫।
১৬৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৪।
১৬৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১১।
১৭০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১৯-৩২০।
১৭১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১৬।
১৭২. সমগ্রন্থ, ভূমিকা।
১৭৩. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'হঠাৎ জোয়ার', পৃ. ৩৪৩।
১৭৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪৫।
১৭৫. গৌরকিশোর ঘোষ ঃ গল্প সমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, 'আরশোলা', পৃ.।
১৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫৭।
১৭৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫৯।
১৭৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬০।
১৭৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬১।
১৮০. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'চার প্রৌঢ়ের বারমাস্যা', পৃ. ৩৭৩।
১৮১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭১
১৮২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭০।
১৮৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৭৭।
১৮৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'যাহা যায়', পৃ. ৩৯৮।
১৮৫. সমগ্রন্থ, 'ভূমিকা'।
১৮৬. গৌরকিশোর ঘোষ ঃ গল্প সমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী, হা হা', পৃ. ৪১৬।
১৮৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১৭।
১৮৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১০।
১৮৯. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ভূমিকা'।